অহিংসা ১৩০, ১৩১

সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবিত সকলেরই প্রিয়। তুমিও আপমাকে তাহাদের উপমাস্থলে আনিয়া কাহাকেও বধ বা হিংসা করিবে না।

যিনি আত্মসুখ কামনায় অন্য সুখকামী জীবের হিংসা করেন, তিনি ইহলোকে হইতে অবসৃত হইয়া সুখ প্রাপ্ত হন না।

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বেসং জীবিতং পিয়ং,
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেষ্য ন ঘাতয়ে।
সুখ কামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি,
অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং।

(পালি)

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা,
আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।

(হিতোপদেশ)

রিপুদমন। ৩, ৪, ৫, ২২২, ২২৩

"ও আমাকে মারিয়াছে, ও আমায় গালি দিয়াছে, আমার চুরি করিয়াছে" এই সকল চিন্তা মনে স্থান না দিলে বৈরী আপনাপনি প্রশমিত হয়; কেননা হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা জিত হয় না, প্রেম দ্বারা জিত হয়।

ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করিবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে, কৃপণকে দান দ্বারা, অসৎকে সত্য দ্বারা জয় করিবে।

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিয়ং দানেন, সচ্চেন অলিকবাদিনং। (পালি)

অক্রোধে জিনিবে ক্রোধ
অসাধুতা সাধু আচরণে,
অসত্য জিনিবে সত্যে
কদর্য্যে করিবে বশ—ধনে। (পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম)

সেই সারথী, যে ক্রোধকে আপনার বশে রাখিতে পারে,—অপর ব্যক্তি কেবল রাশ-রজ্জু-ধারী।

বুদ্ধিহীন যেই জন, মন যার সতত অস্থির,
তাহার ইন্দ্রিয়গণ দুষ্ট অশ্ব যেন সারথীর।
যেই জন সুবুদ্ধি, কর্ত্তব্যে যার নাহিক আলস্য,
তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথীর বশীভূত অশ্ব। ঐ

আত্ম সংযম। ৮০, ১০৩

উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা, উসুকারা নময়ন্তি তেজনং, (বেণুং)
দারুং নময়ন্তি তচ্ছকা, অত্তানং দময়ন্তি পণ্ডিতা।

কূপখন্তা জলের গতি নিয়ন্ত্রিত করে, ইষুকার মনের মত বাণ গড়িয়া লয়, সুতার কাষ্ঠ বাঁকা সোজা ইচ্ছামত গড়ে, জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাকে আপনি নিয়মিত করেন।

যিনি যুদ্ধে সহস্র লোকের উপর জয়লাভ করেন তিনি জয়ী নহেন, যিনি আপনাকে আপনি জয় করেন তিনিই যথার্থ বিজয়ী।

সংসার। ১৭০, ১৭১

যথা বুব্বুলকং পস্সে যথা পস্সে মরীচিকং,
এবং লোকং অবেক্খন্তং মচ্চুরাজা ন পস্সতি (পালি)

সংসার জলবিম্বপ্রায় দেখিবে, মরীচিকা-সমান জ্ঞান করিবে; যিনি সংসারকে এইরূপে দেখেন, মৃত্যুরাজ তাঁহার কাছে ঘেঁসিতে পারে না।

এই চাকচিক্যময় সংসার যেন রাজার রথ, বাহির হইতে দেখিবার জিনিস। মূঢ় ইহার প্রতি আসক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাকে স্পর্শ করেন না।

মৃত্যু। ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯

"এইখানে শীত গ্রীষ্ম কাটাইব, এখানে বর্ষা যাপন করিব" মূঢ় ব্যক্তি এই ভাবনায় অস্থির—মৃত্যুর অন্তরায় স্মরণ করে না। সুপ্ত গ্রামের উপর বন্যার ন্যায় মৃত্যু আসিয়া পুত্র কলত্র শুদ্ধ তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়—তাহার মন বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। পিতা পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। ইহা জানিয়া জ্ঞানী ও সাধুপুরুষ শীঘ্রই নির্ব্বাণ পথের কণ্টক মোচন করিবেন।

পরলোকে সহায় হইয়া কেহ নাহি দিবে দেখা,
পিতামাতা, পুত্রদার, জ্ঞাতি বন্ধু; ধর্ম্ম রবে একা।
কাষ্ঠ লোষ্ট্র সমান ভূতলে ত্যজি মৃত কলেবর
বন্ধুগণ যায় চলি, ধর্ম্ম হয় পথের দোসর।

(পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম)

জরা মৃত্যু। ১৪৩, ১৪৮

এত হাসি, এত আমোদ প্রমোদ কিসের জন্য? সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা অবিশ্রান্ত রহিয়াছে। তোমরা অন্ধকারে বাস করিয়া কেন না আলো অন্বেষণ কর?

এই দেহ ব্যাধিতে শীর্ণ, জরাজীর্ণ হইয়া ভগ্ন হইয়া যায়, মৃত্যু আসিয়া জীবনকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

আত্মদোষ পরচ্ছিদ্র। ২৫২

পরের দোষে সহজেই দৃষ্টি পড়ে, আপনার দোষ দেখিয়াও দেখি না। প্রতিবেশীর দোষগুলি ভূসির ন্যায় বাহিরে ফেলিয়া দি—নিজের দোষ যত্নে ঢাকিয়া রাখি, যেমন শিকারী পক্ষী হইতে আপনাকে ঢাকিয়া রাখে।

কথা ও কাজ। ৫১, ৫২

কথা মধুর, কাজ বিপরীত,—নির্গন্ধ ফুলের ন্যায় দেখিতে রংচঙে, অথচ গুণ নাই।

ভাল কথা, ভাল কাজ—সুগন্ধ সুবর্ণ পুষ্পের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

সুখ। ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯

আমরা সুখে থাকিব, আমাদের যে ঘৃণা করে আমরা তাহাকে ঘৃণা করিব না। আমাদের যারা দ্বেষ্টা, আমরা তাহাদের মধ্যে দ্বেষশূন্য হইয়া বাস করিব। আতুরের মধ্যে অনাতুর হইয়া থাকিব, লোভীর মধ্যে নির্লোভী হইয়া বাস করিব। আমাদের আপনার কিছুই নাই, অথচ প্রীতিভোজী দেবতাদের ন্যায় আমরা সদানন্দ।

স্থবির কে? ২৭০, ২৬১

যাঁহার শুক্লকেশ, তিনি বৃদ্ধ নহেন; বয়সে বিজ্ঞ হয় না. বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে। সত্য প্রেম ক্ষমা দয়া যাঁর, যিনি জ্ঞানবান ও শুদ্ধচিত্ত, তিনিই স্থবির।

শুক্লকেশ যাহার, সে নহে বৃদ্ধ ;
দেবতা সকলে
তাহারেই জানে বৃদ্ধ,
যৌবনেই বিদ্যা যার ফলে।
(পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম)

মুনি কে ? ২৬৮, ২৭৯

মুর্খ যে, সে মৌন হইলেই মুনি হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি নিক্তির ওজনে সদসৎ বিবেচনা করিয়া, যাহা শ্রেয় তাহা গ্রহণ করেন, যাহা অসৎ তাহা পরিত্যাগ করেন।—তিনিই মুনি। যিনি সংসারের ভাল মন্দ দুই দিক বিচার পূর্ব্বক দেখেন, তিনিই মুনি।

মৌনে মুনি না হয়
না হয় মুনি জটাজুট ভারে,
আপনাকে পছানে যে বিলক্ষণ—
মুনি বলি তারে।
শ্রেয় আর প্রেয় ফিরে মনুষ্য মাঝারে,
ধীর ব্যক্তি উভয়ের প্রভেদ বিচারে।
শ্রেয় যে গ্রহণ করে, বিপত্তি এড়ায়,
প্রেয় যে বরণ করে, সর্ব্বস্ব হারায়। (পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম)

তৃষ্ণা। ২৭১, ২৭২

ব্রত অনুষ্ঠানে, শাস্ত্র অধ্যয়নে, ধ্যান বা বিবিক্ত শয়নে, সংসারীর দুষ্প্রাপ্য মোক্ষ লাভ হয় না। হে ভিক্ষু! তৃষ্ণা নিবৃত্তি না হইলে এই সমস্ত সাধনার আশ্বাসযুক্ত হইও না।

কামনা যে ত্যজে তার সব ধন মিলে,
সুখের প্রবাহ বহে লোভ তেয়াগিলে।

(পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম)

ভিক্ষু কে? ৯, ১০, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০

যে ব্যক্তি কশায় (পাপ) হইতে বিমুক্ত না হইয়া কাষায় (গেরুয়া বসন) পরিধান করিতে চান, যিনি মিতাচারী ও সত্যবান নহেন, তিনি কাষায়ের যোগ্য নহেন। যিনি 'কশায়' হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ, মিতাচারী ও সত্যপরায়ণ, তিনিই কাষায় বসনের উপযুক্ত।

যিনি হস্ত পদ বাক্য বশে রাখেন, যিনি সংযত ও জিতেন্দ্রিয়, যিনি আপনাতে আপনি আনন্দময়, যিনি সন্তুষ্টচিত্তে বিজনে বাস করেন—তিনিই ভিক্ষু।

হে ভিক্ষু! নৌকার বোঝাই ফেলিয়া দিয়া ইহাকে হাল্‌কা কর, হাল্‌কা হইলে দ্রুত চলিবে। রাগ দ্বেষ দূরে ফেলিয়া নির্ব্বাণ পথের যাত্রী হও।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের বন্ধন ছেদন কর; যিনি এই পঞ্চ শিকল ভাঙ্গিয়াছেন, তিনিই 'ওঘোত্তীর্ণ' ভিক্ষু।

৩৩০। মূর্খের সহবাস অপেক্ষা একাকী বিজনে বাস ভাল। পাপাচরণ করিও না, অরণ্যে যেমন হস্তী চরিয়া বেড়ায়, তুমিও সেইরূপ একা একা মনের সুখে ফিরিয়া বেড়াও।

২৭৬। মুক্তি সাধনে তোমার আপনার চেষ্টা চাই, তথাগত উপদেষ্টা মাত্র। নির্ব্বাণ পথে সাবধান হইয়া চল, নহিলে মারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই।

৩৩৭-৩৩৮। বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিলেই নষ্ট হয় না, তাহার মূল যতক্ষণ অক্ষত থাকে ততক্ষণ সে মরে না, আবার বাড়িয়া ওঠে; তৃষ্ণার বিষয় বিনষ্ট হইলেও দুঃখ পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে। মারের হস্ত হইতে যদি পরিত্রাণ চাও, তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটন কর।

একটা গাছ কাটিলে কি হইল? সমুদয় বন কাটিয়া ফেলা চাই। হে ভিক্ষু! সমস্ত বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নির্ভীক ও নির্ম্মুক্ত হও।

যে ব্যক্তি সদাচারী শান্ত সমাহিত হইয়া বুদ্ধের আদেশ পালন করেন, তিনি বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্তি ও নির্ব্বাণানন্দ উপভোগ করেন।

উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ, জটা ধারণ, ভস্ম লেপন, ভূমি-শয়ন, এ সকলি নিষ্ফল—যতক্ষণ অন্তরে বাসনানল প্রদীপ্ত রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ কে? ৩৯১, ৩৯৬, ৩৯৯,৪০১, ৪২২

জটাজুট ধারণ করিলে ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণ হয় না; যাঁহাতে ন্যায় সত্য অধিষ্ঠান করে, তিনিই ব্রাহ্মণ।

রে মূর্খ! জটাধারণে কি ফল? অজিন বসন পরিয়া কি লাভ? ভিতরে লোভ ভরপূর, বাহিরের চাকচিক্যে কি হইবে?

যিনি লোভী ও অহঙ্কারী, ব্রাহ্মণ জন্মিয়াই তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। যিনি নির্ধন অথচ বিষয়সুখে নির্লিপ্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ।

তিনিই ব্রাহ্মণ, যিনি সকল শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া নির্ভয় হইয়াছেন— যিনি মুক্ত ও স্বাধীন।

যিনি বিনাদোষেও দণ্ড তিরস্কার অবমাননা অকাতরে সহ্য করেন, ক্ষমা যাঁর বল, তিতিক্ষা যাঁর সেনা, তিনিই ব্রাহ্মণ।

যিনি পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায়, সূচি অগ্রে সরিষার বীজের ন্যায় সংসারের সুখ দুঃখে নির্লিপ্ত থাকেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

৩৯১। মনোবাক্ কর্ম্মে যিনি দুষ্কৃতশূন্য, এই তিনেতেই যিনি সংবৃত ও শুদ্ধাচারী, তিনিই ব্রাহ্মণ।

মনোবাক্যে কর্ম্মে যাঁরা
না করেন পাপ আচরণ,
তাঁহারাই তপস্বী, তপস্যা নহে
দেহের শোষণ। (পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম)

জন্মিয়া যিনি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি না—সে ত ধনবান, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে ভো ভো বলিয়া বেড়ায় (ভো-বাদী); কিন্তু যিনি আসক্তিহীন অকিঞ্চন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

রাগ দ্বেষ মদমাৎসর্য্য সূচি অগ্রে সরিষার বীজের ন্যায় যাঁহা হইতে পতিত হইয়াছে, তিনিই ব্রাহ্মণ।

যস্‌স রাগো চ দোসো চ মানো মক্‌খো চ পাতিতো,
সাসপো রিব আরগ্‌গে তমহম্ ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

যিনি সংসারের মোহময় দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যিনি ধ্যানশীল, অকপট, শুদ্ধ-ভাষী, অনাসক্ত, সন্তুষ্টচিত্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ।

আদিত্য দিবসে দীপ্তি পান, চন্দ্রমা রাত্রে প্রকাশ পান, ক্ষত্রিয়ের তপস্যা কবচ ধারণ, ব্রাহ্মণের তপস্যা ধ্যান, বুদ্ধ অহো-রাত্রি স্বকীয় তেজে প্রকাশিত।

ব্রাহ্মণ কি, না বাহিত পাপ; শমচর্য্যা হইতে শ্রমণ; যিনি মালিন্য পরিবর্জন করেন, তিনি পরিব্রাজক।

যিনি আপনার পূর্ব্ব নিবাস জানেন, স্বর্গ নরক দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিতে পান, যাঁর জন্মবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, সত্ত্বগুণের আধার যে মুনি, তিনিই ব্রাহ্মণ।

নির্ব্বাণ।—

নত্থি রাগসমো অগ্গি, নত্থি দোসসমো কলি,
নত্থি খন্ধাদিসা দুক্খা, নত্থি সন্তিপরং সুখং।
জিঘচ্ছা পরমা রোগা, সঙ্খারা পরমা দুখা,
এতং ঞত্বা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুখং।
আরোগ্য পরমা লাভা, সন্তুট্‌ঠি পরমং ধনং,
বিস্‌সাস পরমা ঞাতী, নিব্বানং পরমং সুখং।

রাগ সমান অগ্নি নাই, হিংসার ন্যায় পাপ নাই,
শরীরের ন্যায় দুঃখ নাই, শান্তির ন্যায় সুখ নাই।
হিংসা পরম ব্যাধি, সংস্কার পরম দুঃখ,
নির্ব্বাণ পরম সুখ, যিনি এই জানেন তিনি সত্য জানেন।
আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন,
বিশ্বাস পরমাত্মীয়, নির্ব্বাণই পরম সুখ।

“সন্তোষ সুখের মূল, ইথে নাহি ভুল।
অসন্তোষই যত কিছু অসুখের মূল।

অন্ত কভু নাহি জানে দুরন্ত পিয়াস,
সন্তোষ কেবলি এক সুখের নিবাস।
ক্ষমাই পরম শান্তি, ধর্ম্মই কল্যাণ মূর্ত্তিমান,
বিদ্যাই পরম তৃপ্তি, অহিংসাই সুখের নিদান।”

(পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম)

শরৎ-কুমুদের ন্যায় আপন হাতে স্নেহ মমতা ছিঁড়িয়া ফেল, শান্তি-মার্গ অনুসরণ কর; সুগত (বুদ্ধ) নির্ব্বাণরূপ সুগতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

যিনি দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখনাশ, দুঃখান্তকারী অষ্টাঙ্গ মার্গ, এই চতুরার্য্য সত্য সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হন, তিনি ক্ষেম পদ, পরম শরণ লাভ করেন। এই শরণ লাভ করিয়া জীব সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হয়েন—ইহাই ধর্ম্মপদ সার সংগ্রহ।

এই সকল শাস্ত্র ভিন্ন অনেকানেক ভাষ্য, টীকা, গাথা, ইতিবৃত্ত ব্যাকরণাদি পালি ও সিংহলী ভাষায় বিরচিত হইয়াছে। ভাষ্যকারের মধ্যে বুদ্ধঘোষের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইনি বৌদ্ধদের সায়নাচার্য্য। বুদ্ধগয়ার ব্রাহ্মণকুলে ইঁহার জন্ম—রেবত নামক এক মহাস্থবিরের উপদেশে ইনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইঁহার ঘনঘোর কণ্ঠরব বুদ্ধের অনুরূপ কল্পনায় ‘বুদ্ধঘোষ’ ইঁহার নামকরণ হয়। এই বৌদ্ধাচার্য্য চূড়ামণি পঞ্চম খৃষ্টাব্দে সিংহলে গমন করত রাজা মহানামের রাজত্ব কালে অনুরাধাপুরে বাস করেন (খৃঃ ৪১০—৪৩২), ও তথায় ত্রিপিটকের মহাভাষ্য (অর্থকথা) রচনা করেন। তাঁহার প্রণীত ‘বিশুদ্ধি মার্গ’, ধর্ম্ম-

পদ-ভাষ্য, ও বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক অন্যান্য অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

মিলিন্দ প্রশ্ন।—

যবনরাজ মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেন, ধর্ম্ম বিষয়ে ইঁহাদের পরস্পর কথোপকথন। খৃষ্টাব্দের দ্বিশতাব্দী পূর্ব্বে এই গ্রীক রাজের রাজত্বকাল। বুদ্ধঘোষের গ্রন্থে মিলিন্দ প্রশ্নের উল্লেখ আছে, অতএব ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে গণনীয়। খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থ রচনার কাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

আমরা যে আকারে মিলিন্দ প্রশ্ন পাইয়াছি, তাহা মূলগ্রন্থ কিম্বা অন্য কোন মূলগ্রন্থের পরিবর্ত্তিত সংস্করণ, সে বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

দ্বীপবংশ এবং মহাবংশ।—

সিংহলের দুই প্রখ্যাত পালিগ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয় খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দে বিরচিত, ও ইহাদের মধ্যে সিংহলের ধারাবাহিক ইতিহাস এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত লিখিত আছে।

দাক্ষিণাত্যের হীনযান বৌদ্ধ শাস্ত্র উত্তরদেশীয় মহাযানীদের সর্ব্বাংশে গ্রাহ্য নহে। তাঁহারা ত্রিপিটক মান্য করেন বটে, কিন্তু তাহার উপরে নিজস্ব অনেক ধর্ম্ম ও দর্শনতত্ত্ব যোগ করিয়া দেন, সে সমস্ত অধিকাংশ সংস্কৃতে রচিত। চীন ও জাপান দেশীয় বৌদ্ধদের মধ্যে যে গ্রন্থত্রয় সমধিক আদরণীয় তাহা

সুখাবতী ব্যূহ—দুইভাগ।

অমিতায়ুর্ধ্যান সূত্র।

দুই ব্যূহের একটী 'সুখাবতী' স্বর্গবর্ণনা, অন্যটি অমিতাভের স্বর্গবর্ণনা; স্বয়ং বুদ্ধ তাঁহার শেষবয়সে এই গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। অমিতায়ুর্ধ্যান সূত্রে রাজা অজাতশত্রুর জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহার প্রতি উপদেশ আছে।

বজ্রচ্ছেদিকা নামক মায়াবাদ গ্রন্থখানি জাপানে বহু আদরের বস্তু, বুদ্ধের মুখ হইতে ইহার ধর্ম্মোপদেশ উদ্গীরিত। "সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক" প্রভৃতি অপরাপর সংস্কৃত গ্রন্থ উত্তর শাখার অন্তর্গত।

ললিত বিস্তর।—

ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা ছাড়া বুদ্ধ-জীবনী সংক্রান্ত এই গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য। ইহা সংস্কৃত গদ্যপদ্য-বিরচিত, পদ্য ভাগ প্রাচীনতর বোধ হয়; আর ইহার মধ্যে কতকগুলি অধিকতর প্রাচীন পালি গাথা সন্নিবেশিত: এই গ্রন্থ তিব্বতী ও চীন ভাষায় সম্ভবতঃ একাধিকবার অনুবাদিত হইয়াছে। ফরাসী পণ্ডিত ফুকো (Foucaux) এই তিব্বতী অনুবাদের ফরাসী অনুবাদ করেন। তাঁহার মতে তিব্বতী অনুবাদের কাল ষষ্ঠ শতাব্দী। চীনদেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থ ৭৬ খৃষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। তাহা হইলে খৃষ্টাব্দ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই ঐ গ্রন্থ ভারতবর্ষে প্রচারিত ছিল বলিতে হয়। ললিত বিস্তরে বুদ্ধের জন্ম হইতে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ পর্য্যন্ত জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। গ্রন্থখানি পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক কলিকাতায় এসিয়াটিক্ সোসায়টি হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

এতদ্ভিন্ন তিব্বতী শাস্ত্র, সংখ্যা ভার ও বিস্তৃতি হিসাবে এমনি প্রকাণ্ড ব্যাপার যে, অন্যান্য দেশের সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র অতিক্রম করিয়া উঠে। কিন্তু উহার কোন গ্রন্থ মৌলিক নহে, পালি ও চীন ভাষা হইতে অনুবাদিত।

পালি ভাষা।—

ভারতবর্ষীয় ভাষাবলী সামান্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) আর্য্যভাষা, (২) দ্রাবিড়, (৩) অপর ভাষা। যে সকল ভাষায় ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্র সমুদায় বিরচিত হয়, সেই যে বৈদিক সংস্কৃত, যাহা কিছু কিছু রূপান্তর হইয়া উত্তর কালে সাহিত্য কাব্যের ভাষা, রামায়ণ মহাভারত মনু-সংহিতা কালিদাসের ভাষা লৌকিক সংস্কৃত হইয়া দাঁড়ায়,—সেই সুপ্রাচীন আর্য্যভাষা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া পালি ও প্রাকৃত ভাষা সমুদায় উৎপন্ন হয়; সেই সমস্ত পুনরায় ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া অধুনাতন হিন্দী বাঙ্গলা মারাঠী, গুজরাতী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ-ভাষায় পরিণত হইয়াছে, এ কথা প্রধান প্রধান ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এবং এতদ্দেশীয় আচার্য্যেরাও প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সমস্ত চলিত দেশভাষার প্রসূতি প্রাচীন প্রাকৃত, ইহার ব্যাকরণ কাব্য সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থসকল আমাদের হস্তগত হইয়াছে; এই প্রাচীন প্রাকৃত এখন আমাদের নিকট সংস্কৃতের ন্যায় পণ্ডিতদের পাঠ্য ভাষা, মৃতভাষা হইয়া পড়িয়াছে। পালি এই প্রাচীন প্রাকৃতের শাখাবিশেষ। গৌতমের অভ্যুদয়

কালে পালি এবং মাগধী সম্ভবতঃ একই ভাষা ছিল। কাত্যায়নী, যিনি পালি ভাষার প্রথম ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, তিনি প্রকারান্তরে তাহাই বলিয়াছেন। এই মাগধী পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দি, বাঙ্গলা, বেহারী ও অন্যান্য উপভাষার রূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু পালির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। গৌতমের সময় তাঁহার ভ্রমণক্ষেত্রে সম্ভবতঃ এই ভাষা অথবা ইহার অনুরূপ কোন ভাষা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রের মুল গ্রন্থাবলী এই ভাষায় বিরচিত। অশোকের অনুশাসনগুলি যে ভাষায় প্রচারিত, তাহার মধ্যে পরস্পর কিছু কিছু বিভিন্নতা সত্বেও মোটামুটি সে ভাষা পালি বলা যাইতে পারে। এই পালিভাষা ব্যাকরণ নিয়মে ও সুবিস্তীর্ণ বৌদ্ধ শাস্ত্রে বদ্ধ হইয়া চলৎশক্তি-রহিত হইয়া পড়িল ও মৃতভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। একদিকে সংস্কৃত, অপরদিকে আধুনিক প্রাকৃত, পালি এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী। বৈদিক সংস্কৃত ছাড়িয়া দিলে ইহা ভারতের প্রাচীন ভাষার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। সম্প্রতি এই মহানগরীতে মহাবোধি সমাজ হইতে পালি শিক্ষার উপযোগী একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইতেছে, সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। কি ভাষা-তত্ত্ব, কি তত্ত্ব-বিদ্যা, কি আদি বৌদ্ধধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, কি বুদ্ধের জীবনবৃত্ত ও উপদেশ, কি তৎকালবর্ত্তী ভারতের ইতিবৃত্ত ও সামাজিক অবস্থা—ইহাদের যে কোন বিষয় বলুন, তার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পালি ভাষা শিক্ষা

ও আয়ত্ত করা অতীব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার মূল প্রস্রবন যখন মাগধী, তখন পালি আয়ত্ত করা যে আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য, তাহা বলা বাহুল্য।

সংস্কৃতের অপভ্রংশে যে সকল প্রাকৃত উৎপন্ন হয়, তাহা আর্য্যাবর্ত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রচলিত আর্য্য দেশ-ভাষাগুলি নিম্নলিখিত রূপে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে।

১। পশ্চিম শাখা।

(ক) উত্তর পশ্চিম শ্রেণী

	লোক সংখ্যা
সিন্ধী	২৫,৯০,০০০
কাশ্মীরী	৪০,৯০,০০০
(খ) মধ্য পশ্চিম শ্রেণী	
পঞ্জাবী	১.৭৭,২০,০০০
গুজরাটী	১,১০,৬০,০০০
রাজপুতানী	১,৩১,৫০,০০০
হিন্দি	৩,৫৮,২০০০০
(গ) উত্তর শ্রেণী	
পাহাড়ী	১১,৫০,০০০
নেপালী	৩০,২০,০০০

প্রাচ্য শাখা

(চ) মধ্য প্রাচ্য শ্রেণী

বৈশ্বারী			২,০০,০০,০০০
বিহারী	"	"	৩,০০,০০,০০০,

(ছ) দক্ষিণ শ্রেণী

মারাঠী	"	"	১,৮৯,৩০,০০০

(জ) প্রাচ্য শ্রেণী

বাঙ্গলা	"	"	৪,১৩,৪০,০০০
আসামী	"	"	১৪,৪০,০০০
উড়িয়া	"	"	৯,১০,০০০
			২০,৯৩,২০,০০০

এই সকল উপভাষার মূল যে প্রাকৃত, তাহাও দেশ-ভেদে বহুরূপী হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব খণ্ডে (দক্ষিণ বেহারে) পালি ও মাগধী; পশ্চিমে অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থানে সৌরসেনী। এই দুই প্রদেশের মধ্যভাগে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা ঐ উভয় ভাষার সম্মিশ্রণে 'অর্দ্ধ মাগধী' নামে অভিহিত। এই আর্য্য ভাষাগুলির বহির্ভূত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত যে ভাষা, তাহা 'অপভ্রংশ' বলিয়া পরিচিত। প্রাকৃতের এই চতুরঙ্গ হইতে আধুনিক গ্রাম্য ভাষা সমুদায় বিনিঃসৃত। অন্যান্য প্রাকৃতের সঙ্গে পালি ভাষার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা নিম্নলিখিত লতিকা দৃষ্টে অনায়াসে বোধগম্য হইবে।

---

* এই লতিকা Calcutta Review পত্রের Oct. 1895 সংখ্যায় প্রকাশিত Grierson's Indian Vernaculars প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর ও বিকৃতি।

মহাযান ও হীনযান।—

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান দুই শাখা হীনযান ও মহাযান, ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই দুই শাখার সৃষ্টি হয় নাই। রাজা কণিষ্কের সময় হইতে এই প্রভেদের সূত্রপাত হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে পালি যেমন শাস্ত্রীয় ভাষারূপে গৃহীত হইল, তিনি সেরূপ না করিয়া সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র রচনার আদেশ করিলেন এবং সেই আদেশানুসারে তাঁহার জালন্ধর সভায় বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষ্যত্রয়, ১। সূত্র পিটকের উপদেশ, ২। বিনয়-বিভাষা-শাস্ত্র, ৩। অভিধর্ম্ম-বিভাষা-শাস্ত্র, সংস্কৃতেই বিরচিত হয়। কণিষ্কের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্র মহাযান নামে অভিহিত এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ মত হীনযান বলিয়া পরিগণিত। দক্ষিণের বৌদ্ধরা এই নামে আপনাদের পরিচয় দিতে প্রস্তুত কি না বলিতে পারি না—বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মপাল এ বিষয়ের খাঁটী খবর বলিতে পারেন। সে যাহা হউক, 'মহাযান' 'হীনযান' এই নাম-করণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে মহাযানীরা হীনযানকে

নিকৃষ্ট পন্থা বিবেচনা করেন ও তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে মনুষ্যের সদ্গতি-সাধন পক্ষে মহাযানই উত্তম সাধন। মহাযান মত যে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে প্রচারিত হয় তাহা বলা যায় না, ঐ প্রদেশেও হীনযান মতাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়; আবার দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধেরাও অনেকে কণিষ্কের প্রভাবে মহাযান মত গ্রহণ করেন। তবে এই কয়েকটী ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে সামান্যতঃ বলা যাইতে পারে যে, সিংহল শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে হীনযান মত প্রচলিত; চীন, জাপান, নেপাল, তিব্বতীয় উত্তর-বাসীগণ মহাযান মতাবলম্বী। অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা মহাযান মতের প্রধান পোষক ছিলেন। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, আমার মতে নামকরণ উল্টা হইয়াছে। বুদ্ধোপদিষ্ট মূল ধর্ম্মের আভাস যদি কোথাও থাকে তাহা পালি ধর্ম্মশাস্ত্রে থাকাই সম্ভব, আর হীনযান মত যদি সেই শাস্ত্র-সম্মত হয় তাহা হইলে ঐ মতটীই আদিম ধর্ম্মের অনুযায়ী হওয়া সম্ভব। উহারই নাম "মহাযান" হওয়া সঙ্গত বোধ হয়।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম।—

বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পদে পদে প্রতিভাত হয়; বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায় মহাযান শাস্ত্ররচনা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ উভয় ধর্ম্মের সম্মিশ্রণ ও একীকরণ আরো ঘনীভূত হইয়া আসে। বৈদিক দেবতা অগ্নি ইন্দ্রাদি বৌদ্ধ দেব-রাজ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন।

ইন্দ্র অনেক সময় মর্ত্ত্যলোকে নামিয়া আসিয়া সাধু পুরুষদের ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করেন। পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাব্রহ্মার জন্য বৌদ্ধ দেবমণ্ডলীর মধ্যে প্রথম হইতেই আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্রহ্মা সহাম্পতি বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় তাঁহার পরম হিতকারী বন্ধুরূপে সময়ে সময়ে আবির্ভূত হয়েন। বুদ্ধের মৃত্যুকালে প্রথমেই যে বিলাপধ্বনি সমুত্থিত হয়, সে ব্রহ্মারই আকাশবাণী। উত্তরকালে বিষ্ণুও বৌদ্ধ দেবাসন গ্রহণ করেন। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর একপ্রকার বিষ্ণু-অবতার। অধ্যাপক মোনিয়র উইলিয়ম্‌স্ বলেন তিনি সিংহলের বিখ্যাত নগরী ক্যাণ্ডিতে মহাবিষ্ণুর মন্দির দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বিষ্ণুদেবের এক রূপার প্রতিমা আছে। ঐ সকল স্থানে কিন্তু বিষ্ণুর অন্য অবতার কৃষ্ণের কোন নামগন্ধ নাই। শিব তাঁহার পত্নীসহ বৌদ্ধরাজ্যে অবাধে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। শিব মহাযোগী, মহাকাল, ভৈরব ও ভীমরূপে, এবং তাঁহার পত্নী পার্ব্বতী দুর্গারূপে, উত্তরদেশীয় বৌদ্ধদের মধ্যে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। নেপালে শিবের মন্দির এবং বুদ্ধের মন্দির পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে—এক দেবতার প্রীত্যর্থ রীতিমত পশুবলি চলে, অন্য দেবতা না জানি তাহা কি ভাবে দৃষ্টি করেন। দেবীগণের মধ্যে তারাদেবী প্রধানা, হুয়েন সাং মগধে তাঁহার মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করেন। নেপালে পঞ্চশক্তির উপাসনা প্রচলিত—বজ্রধাত্রী, লোচনা, মামকী, পাণ্ডুরা, তারাদেবী—এই পঞ্চদেবী। দেবদেবীর সঙ্গে সঙ্গে ভূত, প্রেত, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, গরুড়, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি জীবেরাও বৌদ্ধধর্ম্মে মিশিয়া গিয়াছে।

মার।—

বৌদ্ধদের যদি কোন নিজস্ব দেবতা থাকে, তাহা 'মার'। যদিও 'মার' শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিতে গেলে মৃত্যুর সঙ্গে তাহার বিশেষ যোগ, কিন্তু মৃত্যুরাজ যমের সহিত তাহার তেমন সাদৃশ্য নাই। মারকে বৌদ্ধ সয়তান অথবা পারসিদের অমঙ্গল দেবতা অহ্রিমান বলা যাইতে পারে,—কতকটা শনি বা কলির প্রতিরূপ। ইঁহার এক নাম কামদেব। ইনি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করিয়া কামাদি রিপুসকল উত্তেজিত করেন। বুদ্ধত্ব পাইবার পূর্ব্বে গৌতম যখন বোধিবৃক্ষতলে যোগাসনে আসীন ছিলেন, তখন 'মার' স্বীয় পুত্রকন্যা দলবল লইয়া কত ভয়, কতপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বুদ্ধদেব যোগাসনে অটল রহিলেন, অপ্সরাগণের সহস্র মায়া পরাহত হইল। আবার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পরেও 'মার' বুদ্ধকে অশেষ কুমন্ত্রণা দিয়া ধর্ম্ম প্রচারের শুভ সংকল্প হইতে ফিরাইবার কত চেষ্টা পায়, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মধুর স্বরে ফুস্‌লাইতে থাকে "ভগবন্‌! আপনি অনেক সাধ্য সাধনায় এই দিব্যজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা লোকের মধ্যে প্রচারে কি ফল? সাংসারী যারা, তারা সকলেই বিষয়মোহে মুগ্ধ, কেহই আপনার কথায় কর্ণপাত করিবে না, তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিবে না। আপনি বিজনে আপন মনে একা নির্ব্বাণানন্দ উপভোগ করুন।" বুদ্ধদেবের চিত্ত বিচলিত দেখিয়া ব্রহ্মা

সহাম্পতি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিলেন ও বুদ্ধের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া নিবেদন করিলেন :—

দেখ গো মগধ রাজ্য হ'ল ছারখার,
দুরাচার, অনাচার, অধর্ম্মের জয় ;
প্রভু হে তার হে ভবে, খোল স্বর্গদ্বার,
শুনাও তোমার ধর্ম্ম, বিনাশি সংশয়।
দেখাও হে পুণ্যপথ, পবিত্র, সরল ;
অভ্রভেদী গিরি লঙ্ঘি দাঁড়ায় যে জন
শৈলশৃঙ্গে, দৃষ্টি তার স্থির, অচপল।
সত্যের শিখরে তুমি উঠেছ যখন,
কৃপাদৃষ্টি কর, প্রভু, মানবের পরে,
রোগ শোক জরা মৃত্যু গ্রাসে চরাচর।
জয়হস্ত তুলি, বীর, চল পথ ধরে',
জাগাও ভারতে, মর্ত্ত্যে গৌরবে বিচর।
প্রচারো সত্যের যশ দুন্দুভি-নিঃস্বনে,
পরিত্রাণ কর সবে সুর-নরগণে।

বুদ্ধদেব ব্রহ্মার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া ধর্ম্ম প্রচারে বাহির হইলেন। 'মার' আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

'মারে'র প্রলোভন মন্ত্রতন্ত্র এড়াইতে হইলে কচ্ছপের ন্যায় সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। বুদ্ধদেব গল্পচ্ছলে এই বিষয়ের উপদেশ দিতেন। "একটী কচ্ছপ সন্ধ্যার সময় পানার্থে নদীতীরে গমন করে। সেই একই সময়ে একটা শৃগাল তাহার আহার

অন্বেষণে যায়। শৃগালকে দেখিয়া কচ্ছপ আপন খোলার ভিতরে লুক্কায়িত থাকিয়া নির্ভয়ে জলে সন্তরণ করিতে লাগিল। কখন্ সে তাহার কোষের মধ্য হইতে গ্রীবা বাহির করিবে, শৃগাল তাহা প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু কচ্ছপ কিছুতেই তাহার কোটরের বাহিরে মুখ বাড়ায় না, শৃগাল অনেকক্ষণ বসিয়া অবশেষে শিকার ছাড়িয়া চলিয়া গেল। হে ভিক্ষুগণ! 'মার' এইরূপ তোমাদের ছিদ্রান্বেষণে ফিরিতেছে—তোমাদের চক্ষুদ্বার, কর্ণদ্বার, নাসিকা, জিহ্বা, দেহ-মনোদ্বার কখন্ কোন্ দরজা খোলা পায় সেই অবসর খুঁজিতেছে, সন্ধি পাইলেই প্রবেশ করিবে। অতএব সাবধান! ইন্দ্রিয়দ্বারের উপর নিয়ত প্রহরী নিযুক্ত রাখ, তাহা হইলে পাপাত্মা 'মার' বিফল-প্রযত্ন হইয়া তোমাদের ছাড়িয়া দূরে যাইবে, শৃগাল যেমন কচ্ছপ হইতে দূরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।"

বুদ্ধতত্ত্ব।—

আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের নিরীশ্বর কঠোর ধর্ম্মনীতি বৌদ্ধ সমাজে অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। সে ধর্ম্ম যে যে দেশে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সেই সেই দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম ও রীতি নীতি আচার ব্যবহারের সহিত সম্মিশ্রণে নব নব রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই আদিধর্ম্ম কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া কোথায় কোন্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে,—নেপালে শৈব শাক্ত তান্ত্রিক ধর্ম্মে মিশিয়া একরূপ, তিব্বতে যাদু ভূত প্রেতে বিশ্বাস-

মিশ্রিত অন্যরূপ, এক ঐতিহাসিক বুদ্ধ হইতে অগণ্য কাল্পনিক বুদ্ধের সৃষ্টিপ্রণালীই বা কিরূপ—সে এক অপূর্ব্ব কথা। তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়, আর ঐ গ্রন্থের বিষয় সংগ্রহও সামান্য পরিশ্রম ও গবেষণার কার্য্য নহে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যেমন স্বয়ং নেপালে অবস্থিতি করিয়া তথাকার পুরাতন পুঁথি অন্বেষণ ও বৌদ্ধধর্ম্মের রহস্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার মত শ্রম, অধ্যবসায় ও স্থানীয় গবেষণা ভিন্ন ওরূপ কার্য্যে ফললাভ করা অসম্ভব। সে যাহা হউক, এই স্থলে বুদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্থূল স্থূল গুটিকতক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধ-কাহিনী সম্বন্ধে একটি কৌতুকজনক বিষয় বলিবার আছে, তাহা বলিয়া রাখি। সেটি এই যে, খৃষ্টীয় সেণ্ট্ মণ্ডলীর মধ্যেও বুদ্ধদেবের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সেণ্ট জোসাফৎ।—

জোয়ন্নস নামে একজন গ্রীক গ্রন্থকার 'বালাম ও জোসাফৎ' বলিয়া গ্রীক ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সে উপাখ্যানটী বুদ্ধচরিতের অবিকল চিত্র। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা ঐ জোসাফৎকে আপনাদের সেণ্ট্রূপে আত্মসাৎ করিয়া লন; এমন কি, ৩০শে নবেম্বর তাঁহার মৃত্যুর দিন বলিয়া পালিত হইয়া থাকে। তাঁহার এই উপাখ্যান নানা

ভাষায় অনুবাদিত হইয়া এক সময়ে ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা মধ্যেও মহাসমাদরে পরিগৃহীত হয়। পরে জানা গেল এই জোসাফৎ বোধিসত্বের নামান্তর,—ইনি আর কেহ নন, স্বয়ং বুদ্ধদেব। উল্লিখিত গ্রীক গ্রন্থকারের পিতা খালিফ আলমানসুরের একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন, সুতরাং তিনি অষ্টম খৃষ্টাব্দের লোক। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি। পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন যে, জাতক-ভাষ্য বা ললিতবিস্তর হইতে উহার অনেক কথা রচিত হওয়া সম্ভব। "অতএব অবনীমণ্ডলে বুদ্ধের মহিমা যেমন ব্যক্তভাবে, সেইরূপ অব্যক্ত ভাবেও পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়।"

বুদ্ধতত্ত্ব—হীনযান মত।—

হীনযান ও মহাযান, এই দুই শাখার মধ্যে বুদ্ধতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। বিষয়টীর স্পষ্টীকরণ জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের গোড়ার কথা হইতে আরম্ভ করা আবশ্যক।

বৌদ্ধধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস আলোচনা করিবার সময় বলা হইয়াছে যে, ঐ ধর্ম্মে ভজন পূজনের কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম চা'ন সাধন। বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ এই যে, আত্ম-প্রভাব দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া অন্তঃকরণকে কাম, ক্রোধ, দ্বেষহিংসা মদমাৎসর্য্য হইতে বিনির্মুক্ত কর, তাহা হইলেই স্বর্গাৎ স্বর্গে আরোহণ করত যাত্রার চরম সীমা যে নির্ব্বাণ, সেখানে গিয়া পৌঁছিতে পারিবে। নির্ব্বাণে উঠিবার চারি

ধাপ ও পথের বিঘ্নকারী দশ 'সংযোজন', বন্ধন বা শৃঙ্খল* আছে। এক এক ধাপে উঠিতে উঠিতে এই শৃঙ্খলগুলি কিয়ৎ পরিমাণে খসিয়া যায়। যিনি প্রথম ধাপে উঠিয়াছেন, তিনি 'সোতাপন্নো' (স্রোত-আপন্ন), মনুষ্যের নীচে পশ্বাদি যোনিতে তাঁহার জন্ম হয় না। দ্বিতীয় ধাপে কতকগুলি শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যায়, যিনি সেই ধাপে চড়িয়াছেন তিনি আরো উন্নত, তথাপি সংসার-বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই; তাঁহাকে আর একবার ফিরিতে হইবে, তিনি সকৃৎ আগামী। তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিলে কাম ক্রোধ বিচিকিৎসা প্রভৃতি পঞ্চ বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ হয়, তখন সাধক 'অনাগামী' পদ লাভ করেন, তাঁহার এই মর্ত্ত্যলোকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। এই হ'চ্ছে তৃতীয় ধাপ। যিনি চতুর্থ সোপানে

---

* দশ সংযোজন (শৃঙ্খল):—

১। সক্কায় দৃষ্টি, অহমিকা
২। বিচিকিৎসা, সংশয়
৩। শীলব্রত, কর্ম্মকাণ্ডে আস্থা
৪। কাম।
৫। প্রতিঘ, ক্রোধ
৬। রূপরাগ, বিষয়কামনা
৭। অরূপরাগ, স্বর্গ-কামনা
৮। মান, অভিমান মদ মাৎসর্য্য
৯। ঔদ্ধত্য
১০। অবিদ্যা

আরোহণ করেন, তাঁহার সমুদায় বন্ধন ছিন্ন হয়—জন্মান্তর-স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধিলাভ হয়, তখন তিনি জীবন্মুক্ত অর্হৎ।

প্রত্যেক বুদ্ধ।—

অর্হতেরা হাজার হোক অপূর্ণ জীব। আধ্যাত্মিক জগতে ইহাঁদের নূতন পাখা উঠিয়াছে, ইহাঁরা সবেমাত্র উড়িতে শিখিয়াছেন। ইহাঁদের লক্ষ্যস্থান, গম্যস্থান এখনো বহু দূর। বুদ্ধ এবং ইহাঁদের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। যে মহাত্মারা ইহাঁদের অপেক্ষাও জ্ঞানধর্ম্মে উচ্চতর পদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম প্রত্যেক বুদ্ধ, অর্থাৎ তাঁহারা নিজ নিজ সাধনা ও পুণ্যগুণে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন, অথচ লোক-মাঝে সেই জ্ঞান বিতরণে অক্ষম। তাঁহারা প্রত্যেকে আপনার মহিমাতেই আপনি বিরাজ করেন। মহাবুদ্ধের সহিত প্রত্যেক বুদ্ধের তুলনা হয় না। মহাবুদ্ধের আবির্ভাব কালে পৃথিবীতে তাঁহাদের আবির্ভাব হয় না। আর তাঁহারা তথাগত, সিদ্ধার্থ, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বুদ্ধ-উপাধি ধারণের যোগ্য নহেন।

বোধিসত্ত্ব।—

প্রত্যেক বুদ্ধের উপরের শ্রেণীতে বোধিসত্ত্বকে স্থাপন করা যাইতে পারে। তিনি অব্যক্ত বুদ্ধ। বোধিসত্ত্বের ভিতরে ভিতরে বুদ্ধত্বের বীজ নিহিত আছে, কালক্রমে সে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বুদ্ধত্বে পরিণত হয়। বুদ্ধেরা পূর্ব্বজন্মে বোধিসত্ত্ব ছিলেন, এবং ভবিষ্যতে যে বুদ্ধ সত্যধর্ম্ম পুনঃ স্থাপন করিতে উদয় হইবেন, তিনি এইক্ষণে বোধিসত্ত্বরূপে বিরাজমান।

বুদ্ধদেব।—

এই সপ্ততল গৃহের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় স্বয়ং বুদ্ধদেব আসীন। ইনিই সঙ্ঘ-স্থাপয়িতা সম্যক্-সম্বুদ্ধ সাক্ষাৎ ভগবান। ইনি এবং ইহাঁর সমতুল্য আর আর বুদ্ধ নষ্টধর্ম্ম উদ্ধারের নিমিত্ত, লোকপরিত্রাণের নিমিত্ত, সুরনরের কল্যাণ উদ্দেশে যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েন।

হীনযান মতে গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্বিংশতি বুদ্ধ উদয় হইয়াছেন,—বর্ত্তমান কল্পে তার মধ্যে চার জন। গৌতম শেষ বুদ্ধ; ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি ও কাশ্যপ, এই তিন বুদ্ধ তাঁহার অগ্রবর্ত্তী। করুণা ও মৈত্রীগুণের আধার যে মৈত্রেয়, তিনি ভবিষ্যতে বুদ্ধরূপে উদয় হইবেন, এখনো তার কাল-বিলম্ব আছে। ৫০০০ বৎসর পরে যখন লোকেরা নীতিভ্রষ্ট হইবে, গৌতমের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন সেই বিশ্ববিজয়ী মহাবীর জগৎ উদ্ধারের নিমিত্ত অভ্যুদিত হইবেন। তাঁহার সে দিগ্বিজয় সৈন্য সামন্ত অস্ত্রবলে নয়, ধর্ম্ম ও প্রেম বলে। মৈত্রেয়ী এইক্ষণে বোধিসত্ত্বরূপে তুষিত স্বর্গে বাস করিতেছেন। সূত্র পিটকের অন্তর্গত 'বুদ্ধ বংশে' গৌতম ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ বুদ্ধের জীবনবৃত্ত বর্ণিত আছে, এবং জাতক-ভাষ্যে তাঁহাদের প্রত্যেকের আরো বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। হীনযান শাস্ত্র এইখানেই থামিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের একবিংশতি বুদ্ধ, বর্ত্তমান ভদ্র কল্পের চারি বুদ্ধ, এবং বোধিসত্ত্ব লইয়াই হীনযানীরা সন্তুষ্ট। অর্হৎ তাঁহাদের আদর্শ-সাধু, সাধুত্বের আরো উচ্চ স্তরে উঠিতে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা নাই।

বুদ্ধতত্ত্ব। মহাযান মত—

মহাযানগ্রন্থে বৌদ্ধদের বুদ্ধ-কল্পনার আরো বিস্তৃত বিচিত্র গতি! হীনযানের সহিত ইঁহাদের বীজমন্ত্রে অনৈক্য নাই! ইঁহারাও বলেন মনুষ্য জ্ঞানধর্ম্মে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া, ভিক্ষু হইতে অর্হৎ, অর্হৎ হইতে বোধিসত্ত্ব হইতে পারেন। কিন্তু যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জল দাঁড়ায় কোথায়? দু একটা বোধিসত্ত্ব গড়িয়া কেনই বা স্থির থাকিবে? অনেকানেক ভক্ত সিদ্ধি লাভ করিয়া অর্হৎ হইয়াছেন—অনেকানেক অর্হৎ বোধি-সত্ত্ব পদে উন্নত হইয়াছেন, তাঁহারা কি আমাদের শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র নহেন? এই মতের অব্যর্থ পরিণাম নর-দেবতা পূজা—এবং এই পূজায় মহাযানীরা সিদ্ধহস্ত। এইরূপে অসংখ্য অসংখ্য বোধিসত্ব মহাযানীদের আরাধ্য দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বুদ্ধের প্রথম দুই শিষ্য সারীপুত্র ও মুদ্গলায়ন; কাশ্যপ আনন্দ উপালী প্রভৃতি সঙ্ঘের পিতামহগণ; গৌতম ও রাহুল; মহাযানীদের প্রধান আচার্য্য নাগার্জ্জুন, আচার্য্য অশ্বঘোষ—এইরূপ কত কত সাধু সজ্জনকে তাঁহারা বোধিসত্ত্ব পদে তুলিয়া পূজা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু তা নয়—এদিকে যেমন মানুষী বোধিসত্ব, তেমনি আবার গুণাত্মক ধ্যানাত্মক নানা ধরণের কাল্পনিক বোধিসত্ব নির্ম্মিত হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ আর মৈত্রেয়ী বুদ্ধের আবির্ভাব, এই দুয়ের মধ্যকালে মনুষ্যের ত আরাধ্য দেবতা চাই, বৌদ্ধসঙ্ঘের রক্ষাকর্ত্তা আবশ্যক,—বোধিসত্ত্বেরা এই অভাব পূর্ণ করিতেছেন। আর এক লাভ এই যে, বোধিসত্ত্ব পদলাভের আকাঙ্ক্ষায় মনুষ্যের মনে

ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকতর উৎসাহ সঞ্চার হইতেছে। বোধিসত্ত্বের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। ইহাঁরা তুষিত স্বর্গে দিব্য আরামে কাল-হরণ করিতেছেন। পরিনির্ব্বাণে নিবিয়া যাওয়া অপেক্ষা ইহাঁদের স্বর্গকামনা বোধহয় যেন বলবত্তর, সুতরাং ইহাঁরা নির্ব্বাণ-পথ খুঁজিয়া বেড়াইবার কষ্ট ভোগ অপেক্ষা, যেমন সুখে আছেন তেমনি থাকিতেই ভালবাসেন।

বোধিসত্ত্বের বেলায় মহাযানীরা যেমন কল্পনার লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছেন, বুদ্ধ বিষয়েও সেইরূপ। হীনযানীরা বুদ্ধসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ জন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কেন? তোমরা স্বীকার করিতেছ লোকপরিত্রাণার্থ যুগে যুগে বুদ্ধোদয় হইয়া থাকে। তবে ২৫ কেন,—কত কত লোকে, কত যুগে, কত শত বুদ্ধের অভ্যুদয় হইয়াছে, কে বলিতে পারে? কেন না,

> "কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী"
> কালের নাহিক সীমা, বিপুলা ধরণী।

মহাযান মতানুসারে সমুদায়ে কত বুদ্ধ, স্থির করা কঠিন। হজ্‌সন সাহেব ললিতবিস্তর ও অপরাপর গ্রন্থ হইতে ১৪৩ জন তথাগতের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন।

শুধু বুদ্ধ-সংখ্যা নয়, ক্রমে বুদ্ধস্বরূপেরও অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্ত্তনের প্রণালী আমার যাহা সঙ্গত মনে হয়, তাহা এই—

বুদ্ধদেব আপনাতে কখনই ঐশীশক্তি আরোপ করেন নাই; এমন কি, শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ তাঁহাকে ঈশ্বরবিষয়ক কোন প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নিরুত্তর থাকাই শ্রেয়বোধে মৌনাবলম্বন করিয়া নিস্তব্ধ থাকিতেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্ম এবং তাঁহার সঙ্ঘ, মৃত্যুর সময় এই দুইকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ রাখিয়া গেলেন। কিন্তু পৃথিবী হইতে যেমনি তিনি অপসৃত হইলেন, তাহার কিয়ৎ পরে বৌদ্ধেরা তাঁহাকেই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিল—মনুষ্য-বুদ্ধকে দেবতা-বুদ্ধ গড়িয়া তুলিল। তাঁহার জীবনের সকল ঘটনা,—পূর্ব্বজন্মকাহিনী, স্বর্গ হইতে অবতরণ, গর্ভে বাস, জন্ম, শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনের লীলাখেলা, মহাভিনিষ্ক্রমণ, তপশ্চর্য্যা, মারের সহিত সংগ্রাম, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, ধর্ম্মপ্রচার, নির্ব্বাণ,—ইহার প্রত্যেকটি ইন্দ্রজালে সংগঠিত হইল। এই গেল প্রথমাবস্থা। পরে ভাবিবুদ্ধ যে মৈত্রেয়, তাঁহার পূজাও প্রবর্ত্তিত হইল। বুদ্ধদেব ত পরিনির্ব্বাণগত হইয়াছেন, যাইবার সময় তিনি মৈত্রেয়কেই আপন উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান। মৈত্রেয় এখন জাগ্রত জীবন্ত দেবতা, তাঁহার প্রসাদলাভ ভক্তের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। তিনি করুণার সাগর, সৌন্দর্য্যের সার, প্রিয়দর্শী, মধুরভাষী; তাঁহার তুষিত স্বর্গে গিয়া ভক্তেরা তাঁহার স্বরূপ দর্শন, মধুর বাণী শ্রবণ, তাঁহার সহবাসজনিত আনন্দ সম্ভোগ, এই জন্য লালায়িত; উত্তর দক্ষিণ উভয় সম্প্রদায়ী বৌদ্ধেরাই তাঁহাকে মানিয়া চলিতেছে। অনেকানেক সিংহল বৌদ্ধমন্দিরে বুদ্ধ ও মৈত্রেয়ের মূর্ত্তি পাশাপাশি অবস্থাপিত। হুয়েন সাং ও তাঁহার পূর্ব্বাপর অন্যান্য ভক্তেরা মৃত্যুশয্যায় মৈত্রেয়ের তুষিত স্বর্গলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন।

অতঃপর আমরা আর এক চিত্র দেখিতে পাই,—এক হইতে তিনে গিয়া পড়ি, মৈত্রেয় ছাড়া তিন বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব দেখি। তাঁহাদের নাম—

১। মঞ্জুশ্রী অথবা বাগীশ্বর

২। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর

৩। বজ্রপাণি কিনা শক্তিরূপী মহেশ্বর

এই জ্ঞান শক্তি মঙ্গলের আধার বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তি কালক্রমে কল্পিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের আদি যুগে ইহাঁদের নাম শুনা যায় না, ললিতবিস্তর প্রভৃতি উত্তরশাখার প্রাচীন গ্রন্থেও ইহাঁদের নাম নাই, যদিও সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক ও আর কতকগুলি গ্রন্থে ইহাঁদের কথা পাওয়া যায়, আর ফাহিয়ানের তীর্থযাত্রার সময় এই ত্রিদেবতার অর্চ্চনা কোন কোন বৌদ্ধক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল, তাহাও দেখা যায়। তিনের অঙ্কে কি এক মোহিনীশক্তি আছে, তাহার আদর সর্ব্বত্রই; বিশেষতঃ আমাদের দেশে ত্রয়ীবিদ্যা, ত্রিগুণ, ত্রিবর্গ, ত্রিলোক, ত্রিকাল, ত্রিমূর্ত্তি—অনেক জিনিসেই ত্রিত্ব আসিয়া পড়ে; এমন কি, পরব্রহ্ম যিনি তিনিও সৎ-চিৎ-আনন্দ ত্রিগুণাত্মক। বৌদ্ধদের মধ্যেও এই তিনের গৌরব রক্ষিত হইয়াছে। প্রথম, বুদ্ধ ধর্ম্ম সংঘ ত্রিরত্ন—পরে মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি ত্রিদেব। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই তিন দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরই রূপান্তর। মঞ্জুশ্রী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম, বাগীশ্বর বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রা দেবতা,—এই ত গেল ব্রহ্মা-সরস্বতী। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বিষ্ণু, তাঁহাতে বিষ্ণুর পালনীশক্তি

আরোপিত। বজ্রপাণি বজ্রধর ইন্দ্র অথবা শূলপাণি মহেশ্বর, সর্ব্বশক্তির মূলাধার। বোধিসত্ত্ব-শ্রেণীর মধ্যে অবলোকিতেশ্বরের বিশেষ মাহাত্ম্য। তিনি করুণার্ণব, লোকপাল, সকলের শরণ্য সম্ভজনীয় দেবতা রূপে বর্ণিত। ফাহিয়ান, হুয়েন সাং এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বৌদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার পূজার বহুল প্রচার লক্ষিত হয়। তাঁহারা নিজেও যে ঐ দেবতার পরম ভক্ত ছিলেন, তাহারও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। ফাহিয়ান বলেন সমুদ্রে একবার ঝড় উঠিয়া তাঁহার জাহাজ ডুবিবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন তিনি অবলোকিতেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া রক্ষা পাইলেন। চীন ও জাপানে অবলোকিতেশ্বরের করুণাময়ী নারীপ্রকৃতি ক্বান্ ইন এবং ক্বানন্ নামে অর্চ্চিত হয়।

ইহার উত্তরকালে একপ্রকার ধ্যানীবুদ্ধের সৃষ্টি হইল। ধ্যানীবুদ্ধ মনুষ্যবুদ্ধের অশরীরী প্রকৃতি, তাঁহারা অরূপ-লোকে বাস করেন। পঞ্চ অরূপ-লোকের অধিষ্ঠাতা পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকে ধ্যানপ্রভাবে আত্ম-স্বরূপ হইতে এক একটী বোধিসত্ত্ব উৎসৃষ্ট করেন, আবার প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব পর্য্যায়ক্রমে রূপলোক সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এইক্ষণে চতুর্থ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অধিকার যাইতেছে,—আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই।

এই বহুদেবতার পূজায় পরিতৃপ্ত না হইয়া বৌদ্ধেরা ক্রমে এক আদিদেবে গিয়া পৌঁছিলেন, ইনি নিত্য, নিরাকার, ন্যায় ও করুণার আধার, জ্ঞানময় আদি বুদ্ধ—ইনিই পরব্রহ্ম। নেপালী বৌদ্ধদের মধ্যে দশম শতাব্দে এই আদি বুদ্ধের প্রতিষ্ঠা হয়।

আদি বুদ্ধ ইচ্ছানুসারে আত্মস্বরূপ হইতে অন্য পাঁচটী ধ্যানীবুদ্ধ উৎপন্ন করেন। তাঁহারা আবার পাঁচটী বোধিসত্ত্বের জন্মদাতা। এই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ, পঞ্চ বোধিসত্ত্ব এবং গৌতম, মৈত্রেয় প্রভৃতি পঞ্চ মানুষী বুদ্ধসম্বলিত এক অপূর্ব্ব ত্রিপঞ্চক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

ধ্যানীবুদ্ধ	বোধিসত্ত্ব	মানুষীবুদ্ধ
১ বিরোচন	১ সামন্তভদ্র	১ ক্রকুচ্ছন্দ
২ অক্ষোভ	২ বজ্রপাণি	২ কনকমুনি
৩ রত্নসম্ভব	৩ রত্নপাণি	৩ কাশ্যপ
৪ অমিতাভ	৪ অবলোকিতেশ্বর	৪ গৌতম
৫ অমোঘ সিদ্ধি	৫ বিশ্বপাণি	৫ মৈত্রেয়

দেখিবেন ইহঁাদের মধ্যে প্রকৃত ঐতিহাসিক বুদ্ধ একমাত্র গৌতম, আর সকলেই মন-গড়া কাল্পনিক বুদ্ধ। এই প্রত্যেক পঞ্চকের চতুর্থ দেবতাই বাছিয়া লইবার যোগ্য। বাছিয়া বাছিয়া যে তিন দেবতা বৌদ্ধদের বিশেষ পূজার্হ হইয়াছেন, তাঁহারা হচ্ছেন ১। অমিতাভ, ২। অবলোকিতেশ্বর, ৩। গৌতম। গোড়ায় অপরিমিত জ্যোতিঃ অমিতাভ, মধ্যে তাঁহার অধ্যাত্ম-সুত, শেষে তাঁহার ছায়াময়ী প্রকৃতি। ধ্যানী বুদ্ধের মধ্যে কি জানি কেন মঞ্জুশ্রী স্থান পায় নাই। আপাততঃ ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে বৌদ্ধজগতের কোন কোন ভাগে অমিতাভই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। মহাযান শাস্ত্র তাঁহার 'সুখাবতী' স্বর্গ বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সে স্বর্গ মহম্মদী স্বর্গের ন্যায় ইন্দ্রিয়-সুখ

ভোগের স্থান নয়, তাহা ধ্যানস্থ মুনিঋষির আশ্রম তুল্য। সেখানে 'হুরী' অপ্সরাগণ তাহাদের মায়াজাল বিস্তার করে না. সেই অরূপ-লোকে জ্যোতির্ম্ময় ধ্যানী বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব-মণ্ডলে পরিবৃত হইয়া ধ্যানানন্দ উপভোগ করিতেছেন।

সহজ সত্য ছাড়িয়া কল্পনায় ঈশ্বর গড়িতে গেলে মনুষ্য-কল্পনা যে কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করা যায়।

তান্ত্রিক মত প্রচার।—

মহাযান মতের উৎপত্তি ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরখণ্ডে ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধধর্ম্মের সম্মিশ্রণ আরম্ভ হয়, এই যে বলা হইল— নেপাল তাহার মুখ্য দৃষ্টান্তস্থল। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে সেদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিয়াছে। হিন্দুদিগের যে ধর্ম্ম প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক, নেপালী বৌদ্ধেরা সেই তান্ত্রিক পদ্ধতি নিজ ধর্ম্ম মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইঁহারা শিব শক্তি গণেশ, কুমার ভৈরব হনুমান, রুদ্র মহারুদ্র, মহাকাল মহাকালী, অজিতা অপরিজিতা, উমা জয়া চণ্ডী, খড়গহস্তা, ত্রিদশেশ্বরী, ইন্দ্রী কপালিনী কম্বোজিনী, ঘোরী ঘোররূপ মহারূপা, মালিনী কপালমালা, খট্টাঙ্গা পরশুহস্তা বজ্রহস্তা, মাতৃকা যোগিনী পঞ্চ-ডাকিনী, যক্ষ গন্ধর্ব্ব গৃহদেবতা, ভুত পিশাচ দৈত্য প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত দেবদেবীগণকে স্ব-সম্প্রদায়ে স্থান দান করিয়াছেন। কেবল তন্ত্রোক্ত দেবাদি গ্রহণ করিয়া নিরস্ত হন নাই, তন্ত্র শাস্ত্রের মন্ত্রাদি

এবং সাঙ্কেতিক আঁকজোঁকও গ্রহণ করিয়াছেন। ক্রিয়াস্থলে তন্ত্রোক্ত যন্ত্রমণ্ডল অঙ্কিত করিবার রীতি আছে। হিন্দু ক্রিয়াতে হিন্দুদেবতারই মণ্ডল করা হয়। বৌদ্ধ ক্রিয়াতে বুদ্ধমণ্ডলও অঙ্কিত হইয়া থাকে। নেপালী বৌদ্ধেরা শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে অষ্টমী ব্রত নামে একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। প্রথমে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, দিকপাল প্রভৃতির পূজার পর উল্লিখিত দেবদেবীর আহ্বান ও অর্চ্চনা হইয়া থাকে। (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত।)

নেপালের এই তান্ত্রিকমতের আদিগুরু পেশওয়ার-নিবাসী অসঙ্গ নামক একজন সন্ন্যাসী। ইনি ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া "যোগাচার ভূমি শাস্ত্র" ও যোগ-দর্শন সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ লিখিয়া উক্ত দর্শনের বহুল প্রচার করেন। হুয়েন সাং তাঁহার মঠের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া যান। তিনি শৈব দেবদেবী, ভূত, পিশাচ, বৌদ্ধধর্ম্মে মিলাইয়া সেই পার্ব্বত্য অধিবাসীদের উপাদেয় এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী প্রস্তুত করেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রভাবে নেপালীদের মধ্যে বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত শৈব ও শাক্ত দেবদেবীর অর্চ্চনা আরম্ভ হয়, এবং তাঁহারা বুদ্ধদেবের সরল নীতিমার্গ ছাড়িয়া অলৌকিক সিদ্ধিলাভ মানসে, ধারণী মণ্ডল প্রভৃতি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অবলম্বন করেন। তাঁহাদের মঠ মন্দিরে এই সকল তান্ত্রিক দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম।—

নেপাল ভোট সিকিম ঐ সকল প্রদেশের বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন পৌরাণিক তান্ত্রিক সংস্পর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে, তিব্বতের

ধর্ম্মও অন্যান্য কারণে অশেষ কুসংস্কার জালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। জপমালায় মন্ত্র উচ্চারণ তাঁহারা ধর্ম্মসাধনের এক প্রধান অঙ্গ বিবেচনা করেন; শব্দসংখ্যার উপর পুণ্যের ফলাফল নির্ভর করে, যতবার আবৃত্তি ততই বেশী পুণ্য। আরাধনার সময় যেমন সমস্বরে শ্লোকাবৃত্তির নিয়ম আছে, তেমনি আবার ভিন্ন ভিন্ন বচন অনেকে মিলিয়া একত্রে পাঠ করিয়া থাকেন—অল্প সময়ের মধ্যে যত অধিক শব্দ উচ্চারিত হয় ততই ভাল। এই সকল বৌদ্ধের প্রার্থনা-মন্ত্র হচ্ছে—

* ওঁ মণি পদ্মে হুঁ।

এ প্রার্থনা-অঙ্কিত চক্রধ্বজাদি যেখানে যাও চারিদিকে ছড়াছড়ি। "পদ্মে মণি" এই দুই শব্দের যে কি নিগূঢ় অর্থ তাঁহারাই জানেন, এবং তাঁহাদের বিশ্বাস যে এই প্রার্থনায় দেবতার প্রসন্নতা লাভ ও মহাপুণ্য উপার্জ্জন হয়। এই উদ্দেশে তাঁহারা অগণ্য অগণ্য প্রার্থনা-চক্র নগরে নগরে গ্রামে পথে ঘাটে যেখানে সেখানে স্থাপন করেন, পথযাত্রীরা তাহা একবার ঘুরাইয়া প্রার্থনার ফললাভ করেন। কল ফিরাইয়া প্রার্থনা করা, তিব্বতীরা এই এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চক্র ঘোরানো লইয়া অনেক সময়ে দুই প্রতিযোগী ভক্তদলের

---

* হৃৎপদ্মে ধর্ম্মের মণি। কেহ বলেন, পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রার্থনা মন্ত্র রচিত।

এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ ধর্ম্মপাল মহাশয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিবেন

মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়া যায়। জনকত ফরাসী খৃষ্ট মিসনরি এই বিষয়ে এক মজার গল্প করেন। একদিন তাঁহারা এক মঠের নিকটস্থ একটী প্রার্থনা-চক্রের কাছ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন দুই জন লামার মধ্যে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত। ব্যাপারখানা এই যে, তাঁহাদের একজন চাকা ঘুরাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া যাইতেছেন, মুখ ফিরাইয়া দেখেন আর একজন লামা সে চাকা থামাইয়া নিজের খানায় পুণ্যের আঁক পাড়িবার অভিপ্রায়ে চাকা ঘুরাইয়া দিতেছে—দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ পিছু ফিরিয়া তার চাকা বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার আপনি ফিরাইয়া দেয়। এ বলে আমি ঘুরাইব, আমার চাকায় তুমি কেন হাত দেও? ও বলে আমি ঘুরাইব, তুমি কেন হাত দেও? ক্রমে উভয়তঃ গালাগালি, গালাগালি হইতে মারামারি। অবশেষে একজন বৃদ্ধ লামা বিবাদস্থলে আসিয়া উভয় পুণ্যেচ্ছুর কল্যাণার্থ স্বহস্তে চাকা ঘুরাইয়া উহাদের কলহ মিটাইয়া দেয়। (Buddhism—Monier Williams.)

প্রার্থনা-চক্র ভিন্ন ঐ সকল প্রদেশে প্রার্থনার নিশান উড়িতে দেখা যায়—বোধ করি দার্জিলিং পাহাড়ে ঐ দৃশ্য অনেকে দেখিয়া থাকিবেন; নিশান বাতাসে উড়িয়া যেমন আকাশাভিমুখে যায়, ভক্তজন অমনি মন্ত্রোচ্চারণের পুণ্য উপার্জ্জন করেন।

লামাধর্ম্ম।—

তিব্বতী বৌদ্ধদের আচার অনুষ্ঠান মত ও বিশ্বাস, মূল ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন বিষয়েই মিল নাই; উহাদের পৌরোহিত্য-

প্রধান জনসমাজও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত। তিব্বতী ভিক্ষুর নাম লামা, জনপদের প্রায় পঞ্চমাংশ এই লামা শ্রেণীভুক্ত। লামাদের মধ্যে দুই জন প্রধান লামা, দালাই লামা এবং পঞ্চন লামা; একটীর রাজধানী লহাসা, অন্য লামার মঠ ভারতের প্রান্তসীমার অদূরবর্ত্তী তাসি-লুন্‌পো নামক নগরে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান লামারা বুদ্ধাবতার বলিয়া পূজিত। লোকের বিশ্বাস এই যে, ইহাঁদের কাহারও মৃত্যু হইলে, তাঁহার প্রেতাত্মা কোন একটী শিশু অথবা ছোট বালকে প্রবেশ করে,—এই বালকটীকে চিনিয়া বাহির করাই এক সমস্যা। কখন কখন মৃত লামা মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া যান কোন্ কুলে তিনি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিবেন; কখন বা দুই লামার মধ্যে যিনি জীবিত, তিনি মৃত লামার উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া দেন; কখন বা দৈবজ্ঞের পরামর্শ, শাস্ত্রের বিধান ও অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা মঠাধিকারী লামা নিরূপিত হয়। এই নির্ব্বাচনে চীনরাজেরও মতামত গৃহীত হইয়া থাকে। নবাবতার আবিষ্কৃত হইলে লামামণ্ডলীর কাছে আনিয়া তাঁহার পরীক্ষা হয়; তিনি মৃত লামার গ্রন্থ বস্ত্রাদি চিনিয়া বলেন, ও তাঁহার পূর্ব্বজীবনের ঘটনা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ মহালামা মহাধূমধামে নিজ মঠে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

দালাই লামা আদি বুদ্ধের প্রতিনিধি; তাঁহাকে বৌদ্ধ 'পোপ' বলা অসঙ্গত হয় না। অনেক যুদ্ধবিগ্রহের পর পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে (১৪১৯এ) তিব্বতে দালাই লামার আধিপত্য স্থাপিত হয়। এই লামা বিদেশীদের চক্ষে আকাশকুসুমের ন্যায় দুর্লভ

দর্শন। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন যে কয়েক বৎসর হইল (১৮৮২) আমাদের খ্যাতনামা পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস এই লামার সাক্ষাৎকার লাভ করেন; এ ঘটনাটি আমাদের সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ শরৎ বাবুর ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্ণিত আছে। মোনিয়র উইলিয়ম্‌সের 'বৌদ্ধধর্ম্ম' গ্রন্থে ৩৩১ পৃষ্ঠায় তাহার সারভাগ সন্নিবেশিত হইয়াছে। লামার প্রাসাদ-মঠ লহাসার উত্তর-পশ্চিম পোতালায় অবস্থাপিত। ইহা এক প্রকাণ্ড উচ্চ চৌতালা গৃহ, দশ সহস্র ভিক্ষুর বাসোপযোগী কক্ষরাজিতে সুসজ্জিত; ইহার শিখরদেশ স্বর্ণচূড়ায় বিভূষিত। সিঁড়ির পর সিঁড়ি উঠিয়া পরিব্রাজক মহাশয় লামা-মঞ্চে আরোহণ করিলেন, সেই লোহিত প্রাসাদের উচ্চ শিখর হইতে লহাসা নগরী ও তাহার আশপাশের শোভা সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহার নয়ন-মন মুগ্ধ হইল। মহালামা ৮ বৎসরের বালক, বক্র চক্ষু ছাড়া মুখশ্রী আর্য্যাকৃতি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, রঙ্গীণ রেশম-মণ্ডিত সিংহাসনে দুই সিংহমূর্ত্তি মাঝে উপবিষ্ট। দেহোপরি গৈরিক বসন, মাথায় পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের নিদর্শনস্বরূপ পঞ্চকোণ পীতবর্ণ টোপর। প্রাচীরের গায়ে বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের চিত্রাবলী, জাফ্রাণ রঞ্জিত আরক্ত শান্তিজল সিঞ্চন, ধূপধূনা দীপালোকে আনুষ্ঠানিক ঘটার সীমা নাই। দর্শকমণ্ডলীর জন্য নীচে নয় পংক্তিতে সারি সারি পশমের আসন বিছানো, সকলে শান্ত সংযত ভাবে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিলেন। শরৎ বাবুর আসন তৃতীয় পংক্তিতে। পরে আশীর্ব্বাদের সময় আসিলে দর্শকবৃন্দ মাথা হেঁট করিয়া সিংহাসনের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িল। শরৎ বাবু

বলিতেছেন—"যখন আমার পালা আসিল মহাপ্রভু আমাকেও আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন আমি তাঁহার দেবমূর্ত্তি দর্শন করিবার সুযোগ পাইলাম।" এই বিবরণে পোপের পদাঙ্গুলি চুম্বনের ন্যায় কোন অনুষ্ঠানের আভাস নাই। এই অনুষ্ঠানের এক প্রধান অঙ্গ—চা-পান। লামারা সকলেই এক এক চায়ের পেয়ালা আপন বস্ত্র মধ্যে গচ্ছিত রাখেন। প্রথমে একজন পরিচারক মহালামার স্বর্ণ পাত্রে চা ঢালিয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল, পরে দর্শকগণের পাত্র পূর্ণ হইলে তাঁহারা তিনবার পাত্র নিঃশেষ করিয়া নিঃশব্দে পান করিলেন, পরে শূন্য পেয়ালা বক্ষের পকেট-জাত করিলেন। তৎপরে একটী তণ্ডুলপূর্ণ স্বর্ণথাল মহালামার সম্মুখে আনীত হইল, তিনি তাহা স্পর্শ করিয়া দিলে সেই মহাপ্রসাদ দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইল। পরিশেষে বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ, এই ত্রিরত্নের নামে আশীর্ব্বাদ উচ্চারণের পর দরবার ভঙ্গ হইল। সভাস্থলে একজন লামা, যিনি শরৎ বাবুর পাশে বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার কানে কানে কহিলেন—"তুমি পূর্ব্বজন্মে না জানি কি পাপ করিয়া এমন দেশে জন্মিয়াছ যেখানে জীবন্ত বুদ্ধ নাই!"

তিব্বতের দালাই লামার অধিকার ধর্ম্মরাজ্যেই আবদ্ধ, অথবা এই সঙ্গে তাঁহার কোন রাজকীয় ক্ষমতা সম্মিশ্রিত, এ বিষয় লইয়া এইক্ষণে অনেক স্থানে অনেক কথা শুনা যাইতেছে। সম্প্রতি রুষ সম্রাটের নিকট তাঁহার যে দৌত্য গিয়াছে তাহাই এই সমস্ত তর্কবিতর্কের মূল, এবং তাহা হইতে আমাদের রাজপুরুষদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত

হওয়া বিচিত্র নহে। মেষ-ভল্লুকে মিত্রতা-বন্ধনের চেষ্টা দেখিলে লোকের মনে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। "উনবিংশ শতাব্দী" সংবাদ পত্রে একজন ইংরাজ লেখক দালাই লামাকে বশ করিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলেন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কৃষ্ণা জিলায় যে বুদ্ধদন্তাদি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা উপহার দেওয়া বেশ একটী লামা-বশীকরণ মন্ত্র। আমাদের বিবেচনায় আর কোন উপায় চিন্তা করা আবশ্যক, যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে কোন ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে সং খাপা নামক একজন ধর্ম্মসংস্কারক উঠিয়া গাল্‌ডানে এক প্রকাণ্ড মঠ নির্ম্মাণ করেন। এই লামার মৃত্যুর পর ইঁহার স্বর্গরোহণ উপলক্ষে এক দীপাবলির উৎসব প্রবর্ত্তিত হয়। ইনিও বুদ্ধাবতার বলিয়া পূজিত এবং বৌদ্ধ মন্দিরে ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি দালাই ও পঞ্চন লামা-প্রতিমূর্ত্তির মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত। এ ভিন্ন আরো কয়েক জন লামাগ্রগণ্য মহালামা আছেন, যথা মোঙ্গোলিয়ার কুরুণ, তাতারের কুকু, পেকিনের মহালামা, ভোটের ধর্ম্মরাজ, (যাঁহার উপাধিচ্ছটা আবৃত্তি করিতে কণ্ঠরোধ হয়)—"বুদ্ধশ্রেষ্ঠ, দেবাবতার, শাস্ত্রজ্ঞানে অনুপম, বিদ্যায় সরস্বতীসম, পাপহরণ, দানব-মর্দ্দন, নীতি-নিপুণ, সর্ব্বধর্ম্মশিরোমণি রাজাধিরাজ ধর্ম্মরাজ!" নামাবলীর গৌরবে ইনি গৌতম বুদ্ধকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন।

স্বর্গ নরক।

বৌদ্ধশাস্ত্রে স্বর্গ নরক কল্পনা এইরূপ।—

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড চক্রবালে পরিপূরিত। প্রত্যেক চক্রবালে ছয় প্রকার জীবের বাসযোগ্য ৩০টী সত্ত্বলোক স্তরে স্তরে বিনির্ম্মিত, তাহাদের মধ্যভাগে সুমেরু পর্ব্বত। পাতালে ১৩৬ নরক বিভিন্ন-জাতীয় পাতকীকুলের জন্য নির্ম্মিত, তাহাদের মধ্যে বুদ্ধদ্বেষ্টাদের জন্য 'অবীচি' নরক সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। নরকবাস সুদীর্ঘকাল হইলেও অনন্ত নরকভোগের বিধান নাই। নরকের উপরিভাগে কামলোক চার প্রকার—১। পশু-লোক, ২। প্রেত-লোক, ৩। অসুর-লোক, ৪। নর-লোক। তদুপরি ছয় দেব-লোক। প্রথম, চার মহারাজার (দিক্‌পালের) স্বর্গ—

পূর্ব্বদিকে, গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র।
দক্ষিণে, কুম্ভাণ্ডরাজ বিরূধক।
পশ্চিমে, নাগাধিরাজ বিরূপাক্ষ।
উত্তরে, ধনপতি কুবের।

দ্বিতীয়, ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ ইন্দ্রের অমরাপুরী, যেখানে ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতাদের সঙ্গে রাজত্ব করেন। বুদ্ধজননী মায়া-দেবীর মৃত্যুর পর বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে এই স্বর্গে আরোহণ করেন। তাহা ছাড়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বুদ্ধ নিজেই ইন্দ্র ছিলেন।

তৃতীয়, যমলোক।

চতুর্থ, তুষিত স্বর্গ, বোধিসত্ত্ব-ধাম, মৈত্রেয় যার অধিপতি।

পঞ্চম, নির্ম্মাণরতি স্বর্গ, সৃষ্টিকুশল দেবতাদের বাসগৃহ।

ষষ্ঠ, পরনির্ম্মিত বাসবর্ত্তী স্বর্গ, এখানে যাঁহারা বাস করেন সৃজনকার্য্যে তাঁহাদের নিজেদের ক্ষমতা নাই, তাঁহারা অপর দেবগণের সৃষ্টি-ভণ্ডুলকরণে বিলক্ষণ পটু—বৌদ্ধ সয়তান "মার" এই লোকে বাস করেন। ছয় দেবলোকের তালিকা এই ঃ—

ক

১। চতুর্মহারাজ স্বর্গ
২। ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ
৩। যম স্বর্গ
৪। তুষিত স্বর্গ
৫। নির্ম্মাণরতি দেবগণের স্বর্গ
৬। পরনির্ম্মিত বাসবর্ত্তী স্বর্গ

এই ছয় দেবলোকের উপরিভাগে ১৬টী রূপলোক ধ্যানসিদ্ধ পুরুষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ; যথা—

খ

প্রথম ধ্যান—ব্রহ্মলোক

৭। ব্রহ্ম পরিসজ্জা
৮। ব্রহ্ম-পুরোহিত
৯। মহাব্রহ্ম

দ্বিতীয় ধ্যান—আভাময় লোক

১০। পরিত্তাভা
১১। অপ্রমাণাভা
১২। আভাস্বরা

তৃতীয় ধ্যান—শুভলোক

১৩। পরিত্ত শুভ

১৪। অপ্রমাণ শুভ

১৫। শুভ কৃৎস্ন

চতুর্থ ধ্যান—মহাযোগী স্বর্গ

১৬। বৃহৎ ফল

১৭। অসংজ্ঞাসত্ব

১৮। অবৃহ

১৯। অতপা

২০। সুদশী

২১। সুদর্শন

২২। অকনিষ্ঠ

এই ১৬ রূপ-লোকের শিখরদেশে চারিটি অরূপ-লোক, অশরীরী ধ্যানী বুদ্ধদের আবাস-স্থান।

অরূপ লোক

২৩। আকাশ আয়তন

২৪। বিজ্ঞান আয়তন

২৫। আকিঞ্চন্য আয়তন

২৬। নৈব সংজ্ঞা অসংজ্ঞায়তন

অভিধর্ম্ম মতে অরূপ লোকের সংখ্যা পাঁচ। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ এক এক জন করিয়া পঞ্চ অরূপ লোকের অধীশ্বর। অতএব বৌদ্ধ স্বর্গ নরক সংক্ষেপে এই। বৌদ্ধ মতে জীব ছয় প্রকার—

১ দেবতা, ২ মানব, ৩ অসুর, ৪ পশু, ৫ প্রেত, ৬ নারকী। এই সমস্ত জীবের জন্য ৪ কামলোক, ৬ দেবলোক, ১৬ রূপলোক ৪ অরূপ লোক, এবং ১৩৬ নরক অনন্ত আকাশে সুমেরু পর্ব্বতের উপর নীচে অবস্থাপিত।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়-ভেদ। দার্শনিক শাখা।—

যেমন আচার অনুষ্ঠানে, সেইরূপ দার্শনিক তত্ত্ব-বিচারেও বৌদ্ধজগতে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। অল্পকাল মধ্যেই বৌদ্ধেরা অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে, যথা মহা-সাঙ্ঘিক, স্থবির, এক ব্যবহারিক, চৈত্যবাদ, সর্ব্বাস্তিবাদ, বাৎস্য-পুত্রীয়, কাশ্যপীয়,—এইরূপ নানা মুনির নানা মত প্রচারিত হয়। হুয়েন সাংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং সিংহল গ্রন্থাবলীতে এই অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ইহাদের কোনটী মহাযান, কোনটী হীনযান শাখাশ্রিত। প্রাচীন গ্রন্থে এই যে সম্প্রদায় সমূহের নাম দেখা যায়, ইহাদের কোন শাখা আধুনিক বৌদ্ধসমাজে বিশেষ পরিচিত বলিয়া বোধ হয় না। বৌদ্ধদের মধ্যে এইরূপ মতান্তর ঘটিয়া ক্রমে চারিটি দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে এই চারি মতের নামোল্লেখ আছে,—যথা মাধ্যমিক, যোগাচার, বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক। মাধ্যমিক দর্শন এক-প্রকার বৌদ্ধ মায়াবাদ বলিলেই হয়। ইহার মতে সকল পদার্থই মায়া, নির্ব্বাণও মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। যোগা-চার দর্শনের মতে বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য পদার্থ, আর সকলি মিথ্যা; এই মতের অপর নাম বিজ্ঞানবাদ। বিজ্ঞান দুই প্রকার—

প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং আলয়-বিজ্ঞান। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ার নাম প্রকৃতি-বিজ্ঞান। ঐ জ্ঞানধারা বা জ্ঞানসমষ্টির নাম আলয়-বিজ্ঞান। জ্ঞানসমুহ নানা প্রকার;—কালিক জ্ঞান, দৈশিক জ্ঞান, বস্তু প্রতিবিকল্প জ্ঞান; এই সমস্ত জ্ঞানের যোগাযোগে নিখিল পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ ধারাবাহিক জ্ঞানই 'অহং' বা আত্মা। যেমন অসংখ্য জলকণার সমষ্টি ভিন্ন নদী নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, সেইরূপ জ্ঞানসমষ্টিই আত্মা, 'অহং' পদবাচ্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই; তেমনি আবার জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থও নাই। একমাত্র জ্ঞানই সত্য, ঘটপট প্রভৃতি জ্ঞেয় পদার্থমাত্রেই জ্ঞানের আকারবিশেষ। মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুই মত, একটী বেদান্ত, অন্যটী যোগশাস্ত্রের কতকটা অনুরূপ। অপর দুই সম্প্রদায়ী অস্তিবাদী, অর্থাৎ তাঁহারা আত্মা ও বহির্জ্জগৎ উভয়েরই অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ইঁহাদের পরস্পর কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৈভাষিকেরা কহেন, বাহ্যবস্তু সমুদায় কেবল প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নহে, অনুমান-সিদ্ধ। আমাদের মনে বহির্জ্জগতের প্রতিরূপ উৎপন্ন হয়। সেই প্রতিরূপ হইতেই বিষয়-জ্ঞান জন্মে। জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরূপ, যাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনোদর্পণে প্রতিফলিত হইতেছে, সেই মানসচিত্র হইতে আমরা বহির্ব্বিষয়ের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লই। উভয় মতেই, যে সময়ে বস্তু প্রত্যক্ষ হয় সেই সময়েই অস্তিত্ব থাকে, প্রত্যক্ষ না হইলেই বিদ্যুল্লতার ন্যায় ধ্বংস হইয়া যায়। অর্থাৎ দৃশ্যমান

জগৎ আমার একটা মনের ভাব মাত্র, তাহা আমি ভাবিলেই আছে—না ভাবিলেই নাই। ভাব-জগতের মূল সত্য জগৎ নাই। এই নিমিত্ত হিন্দু পণ্ডিতেরা এই মতের নাম 'সর্ব্ব-বৈনাশিক' দিয়াছেন। বৈভাষিকের আবার চতুঃশাখা—সর্ব্বাস্তিবাদ, মহাসাঙ্ঘিক, সম্মতীয়, স্থবির। ফাহিয়ান বলেন, প্রথমোক্ত দুই শাখার নিয়মাবলী তিনি পাটনার মঠ হইতে সংগ্রহ করিয়া চীনভাষায় অনুবাদ করেন।

ইৎ সিং, যিনি সর্ব্বশেষে এদেশে তীর্থভ্রমণে আসেন, তিনি 'সর্ব্বাস্তিবাদী' ছিলেন; তাঁহার সময়ে উত্তরে এই মত এবং দক্ষিণে 'স্থবির' মতের প্রচার ছিল। হীনযান ও মহাযান সম্বন্ধে ইৎ সিং বলিয়াছেন—"এ দুইই বিশুদ্ধ মত, উভয়ই সত্য, ইহারা উভয়েই ভিন্ন মার্গ দিয়া সেই একই নির্ব্বাণে পৌঁছাইয়া দেয়।"

মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধ দর্শন প্রস্তাবে তাহার চারি তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

১ম। জগতের প্রত্যেক পদার্থই ক্ষণিক

২য়। সকলই দুঃখময়

৩য়। সমুদয়ই স্বলক্ষণ—নিজ নিজ লক্ষণাক্রান্ত

৪র্থ। সকলই শূন্য

যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ফলে দাঁড়ায় এই যে বৌদ্ধ দর্শন শূন্যবাদে পর্য্যবসিত। তাহার মতে সকলই শূন্য, মূলে সত্য বস্তু কিছুই নাই।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কিরূপ পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইয়াছে, তাহার কতক

আভাস পাইয়া থাকিবেন। যাহা বলা হইল তাহা ছাড়া কত দেশের কত উৎসব, পাগোডা, বিহার, ধর্ম্মমন্দিরে বিচিত্র পূজার্চ্চনা, বুদ্ধদেবের মুর্ত্তি ও প্রতিমা পূজা, কত কত বুদ্ধাবতার, বোধিসত্ত্ব—বুদ্ধের অস্থিদন্তের সমাধিক্ষেত্র, কতদিকে কত স্তূপ চৈত্য, কত 'মার' ভূত প্রেত দেব দেবীর কল্পনা, কত প্রকার স্বর্গ নরক কল্পনা, কত প্রকার মত ও সম্প্রদায়—সে সমস্ত আর কত বলিব? ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, আশানুরূপ ফললাভও হয় না। সার কথা এই যে, আদিম বৌদ্ধধর্ম্ম যাহা পালি বৌদ্ধশাস্ত্র মন্থন করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়,—আর প্রচলিত ধর্ম্ম, বিশেষত তাহার উত্তর শাখা—ইহাদের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা এরূপ গুরুতর যে একটী চিত্র দেখিয়া অপরটীকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি, অবনতি ও পতন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শাক্য সিংহ বুদ্ধত্ব পাইবার পর বারাণসীতে গিয়া তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত পঞ্চ ভিক্ষুকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক শিষ্য করিয়া লইলেন; তখন হইতে তাঁহার মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত তিনি যে যে উপায়ে শিষ্যমণ্ডলী সংগ্রহ করিলেন, তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা কিরূপে ক্রমান্বয়ে পরিবর্দ্ধিত হইল, তাহার বিবরণ মহাবগ্‌গে প্রকাশিত। পঞ্চ ভিক্ষুর দীক্ষার পর যশ নামক কাশীর জনৈক ধনী শ্রেষ্ঠিয়া তাঁহার পিতা মাতা পত্নীসহ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। পাঁচ মাসের মধ্যে যাট জন শিষ্য হইল; বুদ্ধ তাহাদিগকে প্রচার-কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিয়া নিজে উরুবেলার বনে গিয়া রহিলেন; তথায় কাশ্যপ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা, এই তিন শিষ্য পাইলেন। এ অঞ্চলে কাশ্যপের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল অনেকগুলি যুবক তাঁহার নিকটে বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধদেব কাশ্যপের আশ্রমের নিকট থাকিয়া উপদেশ দিতেন ও ভিক্ষান্ন সংগ্রহার্থে তাঁহার দ্বারে গমন করিতেন। একদিন গিয়া দেখেন, এক অজগর সর্প কাশ্যপের হোম-কক্ষে ফণা ধরিয়া বসিয়া আছে। বুদ্ধ সাপকে মন্ত্রে বশ করিয়া আপনার ভিক্ষার ঝুলিতে পুরিয়া রাখিলেন। এইরূপ আরো কতকগুলি অলৌকিক

শক্তির পরিচয় পাইয়া কাশ্যপ সদলবলে গৌতমের শিষ্যরূপে দীক্ষিত হইলেন। উরুবেলায় শিষ্যসংখ্যা সর্ব্বসমেত ১০০০ হইল।

এই শিষ্যমণ্ডলী সঙ্গে বুদ্ধ একদিন গয়ার নিকট গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে উপবিষ্ট আছেন, রাজগৃহের অধিত্যকা তাঁহার সম্মুখে বিস্তৃত—এমন সময় সামনের এক পাহাড়ে ঘোর দাবানল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই অনলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব এইরূপে উপদেশ দিলেন—তাহা "আগ্নেয় উপদেশ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাই।

"হে ভিক্ষুগণ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কি হুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছে! দেখ, আদিত্য আদীপ্ত; চক্ষু জ্বলিতেছে, সমুদায় দৃশ্যমান জগতে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই সকল ইন্ধন পাইয়া পঞ্চেন্দ্রিয় জ্বলিয়া উঠিতেছে। বাসনাগ্নি, রাগাগ্নি, লোভাগ্নি, মোহাগ্নি জ্বলিতেছে—জন্ম মৃত্যু রোগ শোক নৈরাশ্য দুর্ম্মনস্য সেই অনলে প্রসূত। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, দেহ মন চিন্তা সকলই এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড। ইন্দ্রিয়সকল কাম্য বস্তুর উপভোগে উত্তেজিত—বাসনানল নিরন্তর প্রজ্বলিত রহিয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ! এই অনিবার্য্য জ্বালা প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সংযত হন; পঞ্চেন্দ্রিয় দেহ মন সকলেরই প্রতি তাঁর বৈরাগ্য জন্মে। এই বিষম জ্বালা কিসে প্রশমিত হয়, এই সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা হইতে কি উপায়ে উদ্ধার পাওয়া যায়, তিনি তাহার উপায় চিন্তা করেন, এবং অবশেষে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য সাধনা দ্বারা সেই নির্ব্বাণ রাজ্যে উপনীত হন, যেখানে বাসনা

ছিন্নমূল ; যেখানে তিনি জন্ম ভয় জরা মৃত্যু জ্বালা যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া শাশ্বত আনন্দ উপভোগ করেন।”

তৎপরে তিনি উরুবেলা হইতে সেনীয় বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে আসিয়া সুপতীর্থের নিকট যষ্টিবন নামক আরাম-কাননে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা বুদ্ধের আগমন সংবাদ পাইয়া স্বীয় অনুচরবর্গসহ বুদ্ধদর্শনে সমাগত হইলেন, তখন অগ্নিহোত্রী কাশ্যপকে দেখিয়া ও তাঁহার শিষ্যত্ব-গ্রহণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্ময়ে অবাক্। বুদ্ধদেব তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া রাজা, ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও অন্যান্য উপস্থিত গৃহপতিগণের সমক্ষে কাশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“কাশ্যপ, তুমি তাপসজনের মধ্যে খ্যাতনামা অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, বল কেন তুমি জপ তপ যাগ যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া এই নবীন পন্থা অবলম্বন করিয়াছ ? তোমার অগ্নিগৃহ শূন্য পড়িয়া রহিবার কারণ কি ? হে উরুবেলার ব্রাহ্মণ, তুমি এমন কি সত্য উপার্জ্জন করিয়াছ, যাহার জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ? স্বর্গমর্ত্ত্যে এমন কি আছে, যার জন্য তুমি লালায়িত ?”

কাশ্যপ উত্তর করিলেন—

“আমি বেশ বুঝিয়াছি হোম যাগ যজ্ঞ নিতান্ত নিষ্ফল, কেন না সে সমস্ত অনুষ্ঠান বাহ্য-আড়ম্বর মাত্র, তাহাতে এমন কিছুই নাই যদ্দারা বিষয়-লালসা প্রশমিত হয়, মোহপাশ হইতে মুক্তি-লাভ করা যায়। আমি জানিয়াছি সংসারের সকলি অলীক, ক্ষণিক, ঘৃণিত, শূন্য। আমি সেই মোক্ষাবস্থার সন্ধান পাই-য়াছি, যে অবস্থায় জন্ম-বন্ধন ছিন্ন হয়, লোভ মোহ দ্বেষ হিংসা

বিনষ্ট হইয়া যায়, বিষয়-তৃষ্ণা স্বর্গকামনা নিরস্ত হয়। আমি সেই পরম সম্পদ লাভ করিয়াছি, যাহার ক্ষয় নাই, পরিবর্ত্তন নাই, এই হেতু হোম বলি যাগযজ্ঞে আর আমার প্রবৃত্তি নাই।” এই বলিয়া তিনি বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইয়া কহিলেন—“ভগবান বুদ্ধই আমার গুরু, আমি ইহাঁর শিষ্য—ভগবান বুদ্ধই আমার গুরু।” তখন উপস্থিত জনগণ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, ও নির্ম্মল শুভ্র বসনে যেমন সহজে রং ধরে, তাহাদের মনও তেমনি সত্য ধারণের জন্য প্রস্তুত হইল। বুদ্ধ তাহাদিগকে সদুপদেশ দিয়া সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন, এবং অনেকে সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়া গৃহীশিষ্যরূপে দীক্ষিত হইলেন। তাহার মধ্যে রাজা বিম্বিসারও একজন।

পরে রাজা বিম্বিসার বুদ্ধদেবের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, “প্রভো! আমি যখন যুবরাজ ছিলাম, তখন আমার মনের সাধ এই পাঁচটী ছিল—প্রথম, রাজ্যাভিষেকের অভিলাষ; দ্বিতীয়, আমার রাজ্যে বুদ্ধদেবের চরণধূলি পড়ে, এই ইচ্ছা; পরে তাঁহার দর্শন, উপদেশ শ্রবণ, এবং তাঁর উপদেশের মর্ম্মগ্রহণ। প্রভো, আমার এই পাঁচটী মনোরথই পূর্ণ হইয়াছে, আমি এখন আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। এইক্ষণে আমার মিনতি এই যে, প্রভু ভিক্ষুমণ্ডলী লইয়া কল্য রাজবাটীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন।” বুদ্ধদেব মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। পরদিন মধ্যাহ্নপূর্ব্বে বুদ্ধদেব শিষ্যবর্গসহ প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাজা স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন পরিবেশন পূর্ব্বক তাঁহাদের যথোচিত আতিথ্য

সৎকার করিলেন, এবং ভোজনান্তে বৌদ্ধ সঙ্ঘে বেণুবন উৎসর্গ করিয়া গুরুজীর মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন। (মহাবগ্‌গ)

এই আশ্রমে বুদ্ধদেব দুই মাস অতিবাহিত করেন।

ঐ সময়ে রাজগৃহে সারীপুত্র ও মুদ্গলায়ন, এই দুই ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইহাঁরা পরিব্রাজক সঞ্জয়ের শিষ্য ছিলেন, ও পরম বন্ধুভাবে গুরুর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিতেন। তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা এই যে, আমাদের মধ্যে যিনি প্রথমে মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইবেন, তিনি বন্ধুকে তাহা খুলিয়া বলিবেন। একদিন সারীপুত্র বুদ্ধশিষ্য অশ্বজিৎকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন তিনি রাজগৃহে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার সুন্দর মুখশ্রী এবং প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ানন্দ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তোমার মুখশ্রী কি সুন্দর! তাহাতে কি উজ্জ্বল বিমল কান্তি দীপ্তি পাইতেছে! কাহার মন্ত্রে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ? কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন?"

অশ্বজিৎ কহিলেন, "শাক্যবংশীয় গৌতম মুনি আমার গুরু, তাঁহারই উপদেশে আমি দীক্ষিত"।

সারীপুত্র—"তোমার গুরুর নিকট কি শিক্ষা পাইয়াছ?"

অশ্বজিৎ—"আমি অল্প দিন হইল এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, বিশেষ কিছু জানি না, আমি সবটা আপনাকে খুলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আপনি আমার গুরুজির নিকটে গেলে যাহা জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি সকলি বলিয়া দেবেন—আপনার সর্ব্ব সংশয় দূর করিবেন। বুদ্ধদেব কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল সমস্তই

অবগত আছেন, হেতু-প্রভব ধর্ম্মসকলের হেতু এবং তাহাদের নিরোধ, তাহাদের আদি অন্ত সকলি জানেন, ও সেইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন।" *

সারীপুত্র এই গুটিকত কথার মধ্যে সত্যের কতক জ্ঞান উপলব্ধি করিলেন, দেখিলেন বিশ্বচরাচর সকলি নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর— যাহার জন্ম তাহার মৃত্যু, যাহার আদি তাহার অন্ত অবশ্যম্ভাবী। এই নিয়ত ঘূর্ণায়মান ভবচক্র হইতে কিসে মুক্তি লাভ হয় তাহা ভাবিতে লাগিলেন; এবং কি সত্য জানিলে এই ভব-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, তাহা জানিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

সারীপুত্র মুদ্গলায়নের নিকটে গিয়া স্বীয় মনোভাব ও সংশয় সকল ব্যক্ত করিলেন। উভয়েই বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণের জন্য

---

* শ্লোকটী এই।—

যে ধম্মা হেতু প্পভবা
যেসাং হেতুন্ তথাগতঃ।
অহ যেসঞ্চ যো নিরোধো
এবম্বাদী মহা সমনো (পালি)
যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুস্তেষাং তথাগতঃ।
হ্যবদৎ তেষাং চ নিরোধ—এবম্বাদী মহাশ্রমণঃ (সংস্কৃত)

অর্থ—দুঃখময় এ ভবের উৎপত্তি কোথায়,
শ্রমণ জানেন তার তথা সমুদায়।
কেমনে বা হয় সেই দুঃখের নিরোধ,
তথাগত যথাযথ করি দেন বোধ।

অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের গুরু সঞ্জয়ের অধীনে আর তাঁহারা থাকিতে চাহিলেন না, সঞ্জয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বুদ্ধের আশ্রমে উপনীত হইলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদের আসিতে দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন,—"এই যে দুজন ব্রাহ্মণ দেখছ, ইঁহারা আমার শিষ্যদের মধ্যে কৃতী ও অগ্রগণ্য হইবেন।" এই বলিয়া তিনি স্বহস্তে তাঁহাদের দীক্ষা দান করিলেন। এই দুই শিষ্য বুদ্ধদেবের অগ্রশ্রাবক নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহারা বুদ্ধের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে বসিতেন বলিয়া লোকেরা তাঁহাদের একজনকে 'দক্ষিণ হস্ত', অন্যকে 'বাম হস্ত' শ্রাবক বলিয়া ডাকিত।

এই নবীন শিষ্যদের প্রতি গুরুদেবের বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ দেখে পূর্ব্ব শিষ্যেরা কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন; পরিশেষে তিনি তাঁহাদের সকলকে একত্র করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম-বীজের * ব্যাখ্যান ও সদুপদেশ দানে বিদ্বেষানল প্রশমিত করেন।

---

* দীর্ঘ নিকায়ের মহাপদান সুত্তে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মবীজ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই—

সর্ব্বপাপস্স অকরণং
কুসলস্স উপসম্পদা
সচিত্ত পরিয়োদপণং
এতং বুদ্ধানুসাসনং

অর্থ—অকরণ পাপ-আচরণ,
নিয়ত কুশল-উপার্জন,
চিত্তের সম্যক্ শোধন,
এই বুদ্ধানুশাসন।

কথিত আছে এই রাজগৃহে অবস্থিতি কালে প্রাতিমোক্ষের প্রধান সূত্রগুলি বিরচিত ও বৌদ্ধ সঙ্ঘের পত্তন হয়—সেই প্রথম সভার নাম "শ্রাবক সন্নিপাত।"

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া লোকেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। কেহ বলিল গৌতম আমাদের গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইতে আসিয়াছেন; কেহ বলিল গৌতম আমাদের স্ত্রীদের বিধবা করিবার জন্য আসিয়াছেন; তিনি আমাদের পরিবার সমাজ সকলি উলট পালট করিয়া দিতেছেন; সকলেই গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইতে চলিল। হাজার জটাধারী সন্ন্যাসীকে তিনি শিষ্য করিয়াছেন, সঞ্জয়ের আড়াই শো শিষ্য গুরুকে ছাড়িয়া গৌতমের পদানত; মগধ ভাঙ্গিয়া যুবকেরা দলে দলে তাঁহার পদতলে আসিয়া লুণ্ঠিত। নাগরিকেরা গৌতমের শিষ্যদের এইরূপ বিদ্রূপ আরম্ভ করিল—

> রাজগৃহে আইলেন গুরু মহাশয়,
> আসিয়া পর্ব্বত-চূড়ে বাঁধেন আলয়;
> সঞ্জয়ের শিষ্য সবে বুদ্ধি-বৃহস্পতি,
> কোথায় কে গেল চলে, হায় কি দুর্গতি!

ইহার উত্তরে গৌতম-শিষ্যেরা বলিতেন—

> ধর্ম্মবীর বুদ্ধ যিনি, সত্য তাঁর একমাত্র বল।
> তাঁহার কি দোষ ভাই, মহিমা এ সত্যেরি কেবল।

এইরূপ শাক্যপক্ষীয় ও প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলিত, তা ভিন্ন আর কোন গুরুতর দ্বন্দ্ব বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। বুদ্ধ এই বাগবিতণ্ডার ব্যাপার শুনিয়া কহিলেন—

ভয় নাই, এ বিবাদ অধিক দিন স্থায়ী হইবে না, এক সপ্তাহের মধ্যেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। ফলে তাহাই হইল। (মহাবগ্গ)

বুদ্ধের যে কি আকর্ষণী শক্তি ছিল, তিনি নগরে গ্রামে বনে উপবনে যেখানে যাইতেন তাঁহার দর্শনার্থে, তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে ঝাঁকে ঝাঁকে লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইত। অবন্তী প্রদেশে সোন নামক এক ভক্তের কথা শুনা যায়, ঐ দূর দেশে গৌতমের নাম তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছে, ও তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল। একবার বিরলে বসিয়া তিনি ভাবিলেন, "আমি ভগবান বুদ্ধের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে কখন চাক্ষুষ দেখি নাই। আমার গুরুর আদেশ পাইলে আমি একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিব।" গুরুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন, "যাও, গিয়া ভগবানের শ্রীচরণ দর্শন কর। তিনি আনন্দের উৎস, মধুরভাষী, সংযমী, জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার দর্শনে বহু পুণ্য উপার্জ্জন হইবে।" কিন্তু সোনের দীক্ষাবিধি অনুষ্ঠানের জন্য ১০ জন ভিক্ষু উপস্থিত থাকা আবশ্যক—তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া অনেক কষ্টে এই দশজন ভিক্ষু সংগ্রহপূর্ব্বক সোন শ্রাবস্তী যাত্রা করিলেন, এবং জেতবনে গিয়া বুদ্ধদেবের সন্নিধানে উপনীত হইলেন।

এই সকল ভক্ত বুদ্ধের আশ্রমে আকৃষ্ট হইত, ইহা অপেক্ষাও উচ্চ দলের লোক তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত। বুদ্ধ যখন কোন প্রখ্যাত নগরে বা কোন রাজার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তখন রাজা, নাগরিক, বড় বড় লোকেরা কেহ

রথে, কেহ গজপৃষ্ঠে, তাঁহার উপদেশ শ্রবণার্থ সমাগত হইতেন। 'সন্ন্যাস ধর্ম্ম' নামক বৌদ্ধগ্রন্থের ভূমিকায় আমরা এইরূপ একটী চিত্র দেখিতে পাই। এইরূপ লিখিত আছে যে, একরাত্রে মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁহার প্রাসাদের ছাদে সচিবসহ উপবিষ্ট হইয়া শরতের জ্যোৎস্না উপভোগ করিতেছেন। আহা! সে জ্যোৎস্না কি সুন্দর, কি মনোহর! এই মধুর যামিনীতে সহসা রাজার মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হইল। তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ শ্রমণের মধ্যে এমন সদ্গুরু কে আছেন, যিনি আমার মনের স্পৃহা পূর্ণ করিতে পারেন। মন্ত্রীরা কেহ একজনের নাম, কেহ অপরের নাম করিলেন। পরে রাজবৈদ্য জীবককে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন— "ভগবান বুদ্ধ শিষ্য সমভিব্যাহারে আমার আম্রবনে বিশ্রাম করিতেছেন, তিনশত ভিক্ষু তাঁহার সহচর। ত্রিজগতে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত—তিনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, সুরনর-গুরু, মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব। তাঁহার দর্শনে চলুন, তাঁহার উপদেশ শ্রবণে মহারাজ প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই।" রাজা তখনি হস্তীসজ্জা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়া রাণীদের সঙ্গে সেই মধুময় জ্যোৎস্না রাত্রে রাজগৃহদ্বার দিয়া জীবকের আম্রবনে উপনীত হইলেন।

অনন্তর রাজা কৃতাঞ্জলীপুটে ভগবান বুদ্ধ এবং উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভগবান বুদ্ধদেবের আদেশ হইলে আমি কতকগুলি প্রশ্ন সিজ্ঞাসা করিতে পারি।"

"মহারাজ! আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

প্রশ্ন—"হে দেব! সংসারে নানা শ্রেণীর লোক কাজ করিয়া থাকে, গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম্মের পুরস্কার ইহজীবনেই লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমের কোন পুরস্কার কিংবা লাভ আপনি এরূপ দেখাইতে পারেন কি, যাহার ফল ইহ-জীবনেই ভোগ করা যায়?"

বুদ্ধদেব বলিলেন—"মহারাজ! আপনি কি এই প্রশ্ন আর কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন?"

রাজা পাঁচ ছয় জন ধর্ম্মোপদেষ্টার নাম করিলেন, যথা—পুরণ কাশ্যপ, মস্করী গোশাল, অজিত, কেশকম্বল, ককুধকাত্যায়ন, নির্গ্রন্থনাথপুত্র ও বেলাস্থপুত্র সঞ্জয়। "কিন্তু তাঁহারা কেহই কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। এক্ষণে ভগবন্! আপনাকে আমি সেই প্রশ্ন করিতেছি।"

পরে বুদ্ধদেব নিম্নলিখিত প্রকারে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের ফলাফল বিষয়ে উপদেশ দিলেন।

"মহারাজ! আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, কিন্তু তৎপুর্ব্বে আপনাকে একটি প্রশ্ন করিব।

মহারাজ! আপনার দাসগণ প্রত্যূষে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রমে আপনার সেবা করিয়া থাকে।

তাহারা পরিশ্রম স্বীকার করে, কিন্তু আপনি সমস্ত সুখ সম্ভোগ করেন। ইহাদের মধ্যে যদি একজন মনে করে অপরের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? সে যদি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, যদি তাহার সন্ন্যাসের খ্যাতি প্রচারিত হয়, এবং যদি আপনি শুনিতে পান যে আপনার ভৃত্যগণের মধ্যে একজন সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনে সামান্য আহারে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করিতেছে, তখন কি আপনি তাহাকে পূর্ব্ববৎ দাসবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিবেন?"

রাজা—কখনই না। বরং তাহার সহিত দেখা হইলে আমি আসন হইতে উঠিয়া তাহাকে সম্মান দেখাইব, তাহার সেবাশুশ্রূষার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিব।

—এরূপ হইলে মহারাজ, আপনাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের কিছু ফল ইহজীবনেই লাভ করা যাইতে পারে।

—হাঁ ভগবন! তাহা স্বীকার্য্য, কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোন ফলের বিষয় আপনি বলিতে পারেন কি?

তখন বুদ্ধদেব সন্ন্যাস-ধর্ম্মের হাতে হাতে আরও অশেষ প্রকার ফললাভ হয়, যথা—আত্মসংযম, জীবনের পবিত্রতা সাধন, পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি অর্জ্জন ইত্যাদি একে একে বুঝাইয়া বলিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন—

"মুক্ত-সন্ন্যাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ হয়, তিনি বস্তু ও জীবের

স্বরূপ দর্শন করেন। কোন্ ব্যক্তি কি কর্ম্ম করিতেছে এবং তাহার কি প্রকার অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করিতে হইবে, তিনি তাহা প্রত্যক্ষবৎ বুঝিতে পারেন। যেরূপ, মহারাজ! প্রাসাদ-শিখরে দাঁড়াইয়া কেহ নিম্নে জলস্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পায় লোকগণ কে কি ভাবে কাজ করিতেছে, কে আসি-তেছে, কে কোন্ পথে যাইতেছে, ইত্যাদি। মুক্ত-সন্ন্যাসী কামনার পরিণতি প্রথম দর্শনেই দেখিতে পান। কোন্ কামনার পরিণাম বিষময়, কোন্ পথ কণ্টকময়, কোন্ কামনার দ্বারা উদ্বেগ ও অনর্থের সৃষ্টি হয়, কোন্ কার্য্যের দ্বারা উহা নিবারিত হয়। তাহার বর্ত্তমান কামনা, ভবিষ্যৎ কল্পনা ও অজ্ঞানজনিত মোহ—এই ত্রিবিধ কষ্টের কারণ একেবারে দূর হইয়া যায়। ঈদৃশ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জ্ঞানময়, পরম আনন্দপূর্ণ জীবন লাভ করিয়া চিরশান্তি উপভোগ করে।"

ভগবান বুদ্ধ এইভাবে উপদেশ প্রদান করিলে অজাতশত্রু বলিলেন—"আপনার উপদেশে আমার সকল সংশয় দূর হইল। যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা প্রকাশিত হইল। পথহারা পথিককে পথ দেখাইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ, ভগবন্! আপনি নানা উজ্জ্বল বিচিত্র উপমার দ্বারা আমাকে সত্যের পথ দেখাইলেন। এখন হে দেব! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে আশ্রয়-দানে যেন ত্রুটী না হয়। ভগবন! আমাকে আপনার শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন। আমি যাবজ্জীবন আপনাতে অনুরক্ত থাকিব। আমি মহাপাপী, মলিনতাপূর্ণ এবং ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন। আমি রাজ্যলাভের জন্য আমার পরম পূজনীয়, সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার

স্বরূপ পিতৃদেবকে হত্যা করিয়াছি। তিনি পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ, ন্যায়-পরায়ণ নৃপতি, এবং অতি উদার-চরিত দেবসদৃশ ব্যক্তি ছিলেন। আমার মত নরাধমকে আশ্রয়•দান করুন, যেন ভবিষ্যতে আর আমি পাপ করিতে না পারি।

—মহারাজ! তুমি পাপাসক্ত হইয়া এরূপ কার্য্য করিয়াছিলে, কিন্তু যখন ইহা পাপ মনে করিতেছ, এবং সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না, তখন আমরা তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি। কারণ যে ব্যক্তি পাপকে পাপ বলিয়া মনে করিয়াছে, সে ভবিষ্যতে আর পাপ করিতে পারে না।"*

এই সমস্ত বর্ণনা হইতে আমরা বুদ্ধদেবের জীবন-চিত্র কতকটা মনে আনিতে পারি। তিনি কোন নগরের সন্নিকট হইলে রাজা প্রজা ছোট বড় সকলেই তাঁহার দর্শন আশে ঝুঁকিয়া পড়িত। কুশীনগরে মল্লেরা, বৈশালীর লিচ্ছবি যুবক-গণ তাঁহার দর্শনার্থে সমাগত, তার সঙ্গে অম্বপালী গনিকাও ফেলা যায় না। উপদেশ সমাপ্ত হইলে বুদ্ধের ভক্তমণ্ডলী পরদিন তাঁহাকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিত। মধ্যাহ্নে আহার প্রস্তুত হইলে গৃহস্বামী বলিয়া পাঠাইতেন যে ভোজন প্রস্তুত, তখন বুদ্ধ তাঁহার বসনত্রয় পরিধানপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে সম্যস্থানে উপস্থিত হইতেন। তথায় সুস্বাদ অন্নব্যঞ্জন যাহা কিছু প্রস্তুত হইত, গৃহকর্ত্রীই পরিবেশন করিতেন। আহারান্তে

* শ্রামণ্যফল-সূত্র
সূত্ত-পিটক (বুদ্ধের উপদেশমালা)
দীঘ-নিকায়

শ্রাবকবর্গ দলবলে বুদ্ধপার্শ্বে উপবিষ্ট হইতেন, ও তাঁহার উপদেশামৃত পান করিয়া আনন্দমনে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন।

যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে বুদ্ধদেব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর আস্থাশূন্য ছিলেন, প্রত্যুত ব্রাহ্মণ শূদ্র আর্য্য ম্লেচ্ছ নির্ব্বিশেষে ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে সর্ব্বজাতির সমান অধিকার ঘোষণা করিতেন, তথাপি কার্য্যতঃ দেখা যায় বুদ্ধের প্রথম শিষ্যমণ্ডলী প্রায় সকলেই উচ্চকুলোদ্ভব। বুদ্ধ তিনি নিজে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যও উচ্চকুলজাত। তাঁহার নবোপার্জিত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যে-সকল নাম দেখা যায় তাহা—

সারীপুত্র, মুগ্দলপুত্র, কাশ্যপ, ব্রাহ্মণসন্তান।

আনন্দ, দেবদত্ত, বুদ্ধের আত্মীয়; রাহুল তাঁহার পুত্র।

অনিরুদ্ধ, রাজা শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র।

যশ বণিকসন্তান, তাঁহার কুলমর্য্যাদা কম মনে হয় না। দুই একজন নীচবর্ণও দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, যেমন উপালী— কিন্তু উপালী নিতান্ত সামান্য লোক নহেন, তিনি রাজনাপিত।

সারীপুত্র ও মুগ্দলায়ন, এই দুই ব্রাহ্মণ শিষ্য বুদ্ধের প্রথম শিষ্যদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহারা বুদ্ধদেবের প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত ভক্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সারীপুত্র তাঁর সঙ্ঘের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ভূষণস্বরূপ গণ্য ছিলেন। /আনন্দ তাঁহার প্রিয় শিষ্য, আমরণ গুরুসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধের শেষ বয়সের ঘটনাবলী

আনন্দের সহিত জড়িত, ও তাঁহার অন্তিমকালের শেষ উপদেশ আনন্দকে সম্বোধন করিয়াই প্রদত্ত হয়। উপালীও বৌদ্ধ শাস্ত্রপ্রণেতা বলিয়া বৌদ্ধ সমাজে খ্যাতি লাভ করেন। বুদ্ধের শ্যালক দেবদত্তের সহিত আপনারা কতক পরিচিত আছেন; তিনি স্বীয় গুরুর বিরুদ্ধে যে-সমস্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই কিছু কিছু বলা হইয়াছে।

অতঃপর বুদ্ধের অনেক গৃহস্থ শিষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা গৃহ সম্পত্তি পরিবারে পরিবৃত থাকিয়াও বৌদ্ধ সঙ্ঘে দানাদি অনুষ্ঠানে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ভিক্ষুদলের পার্শ্বে এই সমস্ত ধর্ম্মশীল গৃহস্থেরা দণ্ডায়মান ছিলেন। ভিক্ষুদের নিকট হইতে তাঁহারা উপদেশ গ্রহণ করিতেন, ও তাহার বিনিময়ে অন্ন দান, ভূমি-দান দ্বারা ভিক্ষু সমাজ পোষণ করিতেন। *এই সকল ভক্তের মধ্যে মগধাধিপতি বিম্বিসার ও কোশলেশ্বর প্রসেনজিৎ (পশেনদী) পরিগণিত হইতে পারেন। বিম্বিসারের রাজবৈদ্য জীবক—তিনি শুধু রাজ-পরিবারের বৈদ্য ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-সঙ্ঘের চিকিৎসাভারও তাঁহার হস্তে সমর্পিত ছিল। তাহা ছাড়া অনাথপিণ্ডদ বণিক, যাঁহার অনুগ্রহে বৌদ্ধ সঙ্ঘ বুদ্ধদেবের প্রিয় শান্তি-নিকেতন জেতবন উপার্জ্জন করেন; বুদ্ধদেব প্রচারে পরিভ্রমণ কালে এই সমস্ত গৃহস্থ শিষ্য সংগ্রহ করিতেন। ভিক্ষাদান, ভূমিদান, গৃহ ও উদ্যানে সভার আয়োজন, এইরূপে তাঁহারা ভিক্ষু দলের আতিথ্যসৎকারে নিযুক্ত থাকিয়া বিবিধ উপায়ে ধর্ম্মপ্রচারে সহায়তা করিতেন।

ধর্ম্মপ্রচার।—

ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম যে-সমস্ত কুসংস্কার জালে আচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা ফেলিয়া দিয়া, সেই ধর্ম্মের যে সত্য সুন্দর মধুর ভাব তাহা রক্ষা করিয়া, বাহ্যাড়ম্বর বাদ দিয়া ধর্ম্মের সহজ সত্যসকল আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করিয়া, সমুদায় ভারতবাসীকে মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ করিয়া, বুদ্ধদেব সরল সহজ ভাষায় জাতিকুলনির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণ জনপদের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার কর্ষণক্ষেত্র প্রয়াগের পূর্ব্ব, গৌড়ের পশ্চিম, হিমালয়ের দক্ষিণ ও গন্দোয়ানার উত্তর, এই চতুঃ-সীমার মধ্যবর্ত্তীস্থল—অযোধ্যা, মিথিলা, বারাণসী, মগধ, এই সমস্ত রাজ্য। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার হস্তের বীজ লইয়া দেশ দেশান্তরে ছড়াইবার জন্য বাহির হইলেন।

হিন্দুধর্ম্ম প্রচার-সুলভ বিশ্বজনীন ধর্ম্ম নহে। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ না করিলে হিন্দু হওয়া যায় না—এমন কি হিন্দুসমাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কঠোর নিয়মে আটেঘাটে এমনি বদ্ধ যে, যে ব্যক্তি যে বর্ণে জন্মিয়াছে সে কোন উপায়েই তাহার বাহিরে যাইতে পারে না, এবং স্ববর্ণের গণ্ডীর ভিতর অন্যকে গ্রহণ করিতেও অপারক। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা ও উপদেশ উচ্চ বর্ণেই আবদ্ধ। সে শিক্ষা সর্ব্ব জাতির সাধারণ সম্পত্তি নহে, উচ্চ বর্ণের একচেটিয়া—শূদ্রাদি হীনবর্ণ তাহা হইতে বঞ্চিত। বৌদ্ধধর্ম্ম ইহার ঠিক বিপরীত। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে যেমন স্বধর্ম্ম পালনের উপদেশ দিতেন,

সেইরূপ দেশ বিদেশে বিভিন্ন জনপদের মধ্যে সেই ধর্ম্ম প্রচারেও উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার উপদেশানুসারে ভিক্ষুদল দেশ দেশান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম-বীজ বপনে প্রাণপণে সচেষ্ট হইলেন।

যক্ষ-রক্ষো-দমন।—

বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম প্রচার কালে মধ্যে মধ্যে তাঁহার অসাধারণ বশীকরণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কপিলবাস্তু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বুদ্ধদেব জেতবন বিহারে কিছুদিন বাস করেন। আলাবি নামক নিকটস্থ একটি গ্রামে এক নৃশংস যক্ষ বাস করিত। একদিন বুদ্ধ সেই লোকটিকে দেখিবার জন্য সেখানে গেলেন। তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক্, তাঁহার উপর অকারণে সে তীব্র কটুকাটব্য বর্ষণ করিতে লাগিল। বুদ্ধদেব তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সাধু ব্যবহারে তাহাকে বশ করিলেন। পরে যক্ষ একটু শান্ত হইয়া তাঁহাকে বলিল—হে শ্রমণ! আমি তোমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিতে চাই, তাহার সদুত্তর দিতে পারত ভাল, নতুবা তোমাকে এই জলে ডুবাইয়া প্রাণে বধ করিব। বুদ্ধ তথাস্তু বলিয়া সেই সকল প্রশ্নের যথোচিত উত্তর প্রদান করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। সেই অবধি সে তাঁহার পদানত দাস হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল, এবং ক্রমে তাঁহার সঙ্ঘভুক্ত হইয়া শুদ্ধাচারী সন্ন্যাসীরূপে সুখ্যাতি লাভ করিল। লোকেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া

স্তম্ভিত হইয়া গেল। বুদ্ধদেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি জিজ্ঞাসুদিগকে কি বলিয়া বুঝাইযাছিলেন কোন গ্রন্থে তার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু তাঁহার বাণী আমার কাণে যাহা বাজিতেছে, তাহা এই ঃ—

"আমি অতিথি হইয়া যক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলাম, আমার আতিথ্য সৎকার করা কি তাহার কর্ত্তব্য ছিল না? তাহা না করিয়া সে কুৎসিত গালিমন্দ দিয়া আমাকে অভিবাদন করিল। সৎকারের বদলে তিরস্কার, যেখানে বহুমান দেওয়া উচিত, সেখানে অপমান। আমি সেই অপমান অকাতরে মাথায় তুলিয়া লইয়া শিষ্টাচারে ও সদুপদেশ প্রদানে তাহাকে বশে আনিলাম। সেই অবধি সে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সাধু সন্ন্যাসীর মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। 'অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবেক'—এই যক্ষের জীবনে তোমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপলব্ধি করিলে। আমার এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া চলিলে তোমাদেরও মঙ্গল হইবে।" গ্রামবাসী-গণ বুদ্ধের কথায় প্রীত হইয়া ঐ স্থানে এই আশ্চর্য্য ঘটনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এক অপূর্ব্ব বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিল।

আর একটি ঘটনার এইরূপ বর্ণনা আছে—তাহা অঙ্গুলি-মালকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ।

এই লোকটি কোশলের রাক্ষসতুল্য এক দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি; চুরি ডাকাতি নরহত্যা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। বুদ্ধদেব নির্ভীকচিত্তে জঙ্গলের মধ্যে তাহার কোটরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ধীর নম্রভাবে তাহাকে সদুপদেশ দিয়া

তাহার উদ্ধত উগ্র স্বভাবের পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন। সেই রাক্ষস দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যে অর্হৎ মণ্ডলীতে স্থান লাভ করিল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া তাহার আত্মীয়স্বজনবর্গ চমকিত হইল। সদ্ধর্ম্ম গ্রহণের ফলে কিরূপে মনুষ্যের চরিত্র শোধন হয়, বুদ্ধদেব তাহা লোকদিগকে বুঝাইয়া বলিলে তখন তাহাদের প্রতীতি জন্মিল।

নন্দের দীক্ষা গ্রহণ।—

বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে গিয়া প্রথমে তাঁহার পুত্র রাহুলকে দীক্ষা দান করিলেন, পরদিবস তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণের পালা আসিল। সেদিন নন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেক, ও 'জনপদ-কল্যাণী' নামক একটি লোকপ্রথিতা সুন্দরীর সহিত বিবাহ স্থির হইয়াছিল। গুরুদেব গৃহে প্রবেশ করিয়া নন্দকে নগরের বাহিরে এক বটবৃক্ষ তলে লইয়া গিয়া, তাহাকে যথানিয়মে স্বধর্ম্মে দীক্ষা দান করিলেন। কন্যা ব্যাকুল অন্তরে বরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু বর আর বাড়ী ফিরিলেন না। পরে শুনা গেল, নন্দ তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সন্ন্যাসী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন—সকলি ভাঙ্গিয়া গেল।

সুপ্রবুদ্ধ।—

গুরুদেব তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষা জেতবনে যাপন করেন, তথায় রাহুল তাহার ২০ বৎসর বয়ঃক্রমে উপসম্পদা দীক্ষা গ্রহণ করে। সেই বৎসর তিনি কপিলবস্তু পুনর্দর্শন করিতে যান।

দেবদত্তের ন্যায় বুদ্ধদেবের আর এক গৃহশত্রু ছিল—তাঁহার শ্বশুর সুপ্রবুদ্ধ। কপিলবাস্তুতে প্রবাস কালে বুদ্ধদেব সুপ্রবুদ্ধ কর্ত্তৃক সাতিশয় অবমানিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব নগরের বহিরুদ্যানে এক বটবৃক্ষ তলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সুপ্রবুদ্ধ তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তথাগত ভিক্ষায় বাহির হইবেন শুনিয়া সেই পাষণ্ড মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার পথ রোধ করিতে আসে, ও তাঁহার উপরে বিস্তর কটুকাটব্য বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। গুরুদেব আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—দেখ, লোকটার আসন্নকাল উপস্থিত; এক সপ্তাহের মধ্যে পৃথিবী ইহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। সুপ্রবুদ্ধ এই কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া মনে মনে ভাবিল, আমি সপ্তাহকাল আমার প্রাসাদের স্তম্ভোপরি দিনপাত করিব, দেখা যাক পৃথিবী আমাকে কেমন করিয়া গ্রাস করে। সেই দুরাত্মা ভাবে নাই যে দুরাচারীর কোনখানেই নিস্তার নাই, তাহার পাপের দণ্ডভোগ অবশ্যম্ভাবী। ফলে তাহাই হইল। সপ্তম দিবসে পৃথিবী তার পদতলে বিদীর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহার অপরাধের দণ্ড স্বরূপে তাহাকে 'অবীচি' নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিল।*

---

*বুদ্ধের পঞ্চ বিদ্রোহীর মধ্যে সুপ্রবুদ্ধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল—অপর চারিজন দেবদত্ত, নন্দ, যক্ষ নন্দক, এবং চিঞ্চা।